C. F. Andrews-রচিত What I Owe to Christ

প্রথম প্রকাশ

১৯৩২

এই বঙ্গানুবাদের প্রথম প্রকাশ

১৯৬০

প্রকাশক

সুধীর মুখার্জী

রাইটার্স সিণ্ডিকেট

৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

মুদ্রক

রতিকান্ত ঘোষ

দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৭।১ বিন্দু পালিত লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট

বিভূতি সেনগুপ্ত

চার টাকা

ঋণাঞ্জলি

পুণ্যস্মৃতি

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে,
সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে,
সব-হারাদের মাঝে॥

—রবীন্দ্রনাথ

পিতৃদেব ও মাতৃদেবী

চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ—এই বিদেশী নামটি আমাদের অপরিচিত নয়। এই নামের যিনি অধিকারী তিনি অবশ্য এক প্রিয়তর নামে ভারতবাসীর অন্তরে চির-জাগরূক—সে নাম 'দীনবন্ধু'। শুধু ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত ভারতবর্ষীয় তাঁকে দুঃখ-বেদনার পরম বন্ধু বলে স্মরণ করে। ইংলণ্ডে নিউক্যাসেল-অন-টাইন শহরে অ্যাণ্ড্রুজের জন্ম। এই ভারতভূমিকে তিনি আপন নব-জন্মভূমি বলে গ্রহণ করেন এবং এই কলকাতা শহরেই তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত।

১

১৮৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অ্যাণ্ড্রুজ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র, চতুর্থ সন্তান। অ্যাণ্ড্রুজের পিতা জন এড্‌উইন অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন ধর্মযাজক। আপন বিবেকের প্রতি নির্ভরশীলতা তাঁর যেমন ছিল কুণ্ঠাহীন কঠোর,—ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল তেমনি একান্ত ও সরল। ধর্মযাজক রূপে তাঁর ভক্তদের এবং পিতারূপে সন্তানদের তিনি একটি মাত্র শিক্ষা দিতেন। সে শিক্ষা অকুণ্ঠচিত্তে বিবেকের অনুশাসন মান্য করার শিক্ষা। সমাজের অনুশাসন নয়, সংস্কারের নির্দেশ নয়,—অন্তরের মণিকোঠায় আপন বিবেকের বাণীর ঈশ্বরের বাণী। সেই বাণীই পরম সত্য,—বিপদ আসুক বাধা আসুক, একনিষ্ঠ হয়ে সেই সত্যকে অনুসরণ করো।

এই সুদৃঢ় মনোবল ও একনিষ্ঠ বিশ্বাস পিতা এড্‌উইন অ্যাণ্ড্রুজ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। তাঁর বংশ ছিল ইস্ট অ্যাংলিক্যান পিউরিটান বংশ। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ধর্মকে নিশ্বাসসম জ্ঞান করতেন। ঈশ্বরের বাণীকে জ্ঞান করতেন অমৃতসম। ঈশ্বরের নিত্য-উপস্থিত চৈতন্য তাঁদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করত,—সেই চৈতন্যের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁরা জীবনের প্রতিটি কার্যের মধ্যে নিবেদন করতেন। এই মর-জগতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ যীশুখৃষ্টকে তাঁরা প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন,—

মানব-কল্যাণে যীশুর আত্মদানকে তাঁরা ঈশ্বরের করুণতম আশীর্বাদ বলে মনে করতেন এবং অকুণ্ঠিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে যীশু পুনরায় মরদেহে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নবচরণস্পর্শে পরিত্রাণ পাবে মানুষ।

কোনো গণ্ডীর বন্ধন কোনো সংস্কারের নিগড় তাঁরা কখনো মানেননি, আত্মবিশ্বাসের জন্য কোনো বঞ্চনা-বেদনাকে বরণ করতে ভয় করেননি। অ্যাণ্ড্রুজের পিতামহ জন অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন শিক্ষক। বিবেকের নির্দেশে যীশুর আহ্বানে তিনি শিক্ষকবৃত্তি পরিত্যাগ করেন। প্রভু যীশুর নামে আত্মদানের ব্রত গ্রহণ করেন তিনি।

পিতা এডুইন অ্যাণ্ড্রুজও ছিলেন সংসার-বিরাগী ধর্মাত্মা। সামাজিক প্রতিপত্তি তিনি বুঝতেন না। সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি তাঁর ছিল না। সংসারী হয়েও তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত উদাসীন। সারা জীবন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন যীশুখৃষ্টের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। এই প্রতীক্ষাবিহ্বল নিত্য-রোমাঞ্চিত অন্তর ছিল ঠিক মধ্যযুগের কবি-সন্ন্যাসীর অন্তরের মতো।

ব্যবহারিক সারল্য সামাজিক স্বাধীনতাবোধ ও অবিচল ঈশ্বরানুরাগ চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

অ্যাণ্ড্রুজ-জননী ছিলেন আদর্শ জননী। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ছিল তাঁর। উদাসীন স্বামী,—সব দায়িত্ব তাঁকেই তো বইতে হবে। বৃহৎ সংসারের তিনি প্রতিপালিকা,—সামান্য আয়। ছোট ছোট শিশু। স্বামীকে তিনি দারিদ্র্য বুঝতে দেননি,—পরমযত্নে তিনি সন্তানদের মানুষ করেছেন। স্বামী ও সন্তানদের কল্যাণে তিনি হাসিমুখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো দুঃখ কোনো অভাব কোনো দিন তাঁর স্মিতমধুর মুখে ছায়া ফেলেনি।

তিনিও ছিলেন পরম ধর্মপরায়ণা। শিশুকালে অ্যাণ্ড্রুজ একবার প্রায় ছয়মাস অসুখে ভোগেন। রোগশয্যায় সেবাপরায়ণা জননীকে বড়ো কাছে পান সে-কয়মাস। পুত্রের বেদনা জননী যেন নিজের দেহে উপলব্ধি করতেন। প্রহরের পর প্রহর ধরে জরাক্রান্ত সন্তানের বেদনাপাণ্ডুর ললাটে হাত বুলিয়ে দিতেন জননী, মৃদুস্বরে শোনাতেন খৃষ্টের কাহিনী—যিনি সব চেয়ে ভালোবেসেছেন শিশুদের, কোলে তুলে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন,

বলেছেন,—পৃথিবীর শিশুরা স্বর্গের কুসুম-কোরক। এই রোগশয্যায় মার মুখ থেকেই অ্যাণ্ড্রুজ প্রথম যীশুর অমৃতবাণী শ্রবণ করেন।

অ্যাণ্ড্রুজের জননীর যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। বিবাহের পর স্বামীর এক ঘনিষ্ট বন্ধু এই সম্পত্তির অছি হন। অস্বচ্ছলতার কথা নবদম্পতির মনেও স্থান পায়নি। অ্যাণ্ড্রুজের পিতা ধর্মযাজনা করতেন, কিন্তু কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না এজন্যে। অ্যাণ্ড্রুজের তখন বারো তেরো বৎসর বয়স। হঠাৎ জানা গেল পিতৃবন্ধু অছি তাঁর মার সমস্ত সম্পত্তি কাউকে না জানিয়ে নষ্ট করে গা ঢাকা দিয়েছেন। যেন বজ্রাঘাত হোলো সমস্ত সংসারের মাথায়,—বুঝি সহসা ভূমিকম্পে ধ্বসে গেল সব ভবিষ্যৎ। সংসার-বিরাগী পিতা যেন পাগল হয়ে গেলেন। কী সর্বনাশ! আর এমনি সর্বনাশ করল কিনা তাঁরই বন্ধু যার কাছে স্ত্রীর সর্বস্ব গচ্ছিত রেখেছিলেন! সন্তানদের কাছে ডেকে আনলেন মা,—স্বামীকে ঘিরে বসলেন। প্রবোধ দিলেন, সাহস দিলেন, বললেন,—কিছু ভেবো না, ভয় কোরো না, প্রার্থনা করো। পাশাপাশি বসে স্বামী-স্ত্রী প্রার্থনা করলেন। আরো প্রার্থনা করলেন সেই বন্ধুর জন্যে যে বন্ধু রিপুর তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হয়ে তাঁদের এই সাময়িক বিপদের কারণ হয়েছে,—ঈশ্বর তাকে যেন করুণা করেন।

প্রভু যীশুর আন্তরিক পরিচয় অ্যাণ্ড্রুজ প্রথম লাভ করেন তাঁর জননীর কাছ থেকে। জননীর কাছ থেকে লাভ করেন প্রেম ও করুণার শিক্ষা।

২

অ্যাণ্ড্রুজের বাল্য ও কৈশোরের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় শিল্পনগর বার্মিংহামে। এখানে এসে তিনি স্কুলে ভর্তি হলেন। অবশ্য পিতাই ছিলেন তখন তাঁর ও তাঁর ভাইবোনদের প্রকৃত শিক্ষক। পিতা তাঁকে প্রতিদিন দীর্ঘভ্রমণে নিয়ে যেতেন। ধর্মের কথা আদর্শের কথা মহৎ লোকের জীবন-কথা শোনাতেন। বাল্যকাল থেকেই অ্যাণ্ড্রুজ লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁর উৎসাহ ছিল। আগ্রহ ছিল খেলাধূলায়, ব্যুৎপত্তি ছিল আবৃত্তিতে অভিনয়ে চিত্রাংকনে। বিদ্যালয়ের শেষ

দুই বৎসর তিনি ছাত্র-পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হয়েছিলেন এবং স্বনামে ছদ্মনামে সেই পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশ করেছিলেন।

বালক অ্যাণ্ড্রুজের সাহিত্য প্রীতি ও কল্পনাবোধকে প্রথম জাগ্রত করেছিল সার ওয়াল্টার স্কটের গ্রন্থাবলী। পিতার বইএর আলমারি উঁচুতলায় তাকের পিছন দিকে তিনি এই রচনাবলী আবিষ্কার করেন। একের পর এক স্কটের উপন্যাস পড়তে পড়তে তাঁর কল্পনা কখনো আইভান হো কখনো বা রব রয় কখনো বা মারমিয়নের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের উধাও অভিযানে হাবিয়ে যেত। স্কটের রোমান্টিক সাহিত্যর মূলে যে আর্দশ-গরিমা তা তাঁর বালব-মনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্কটের সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সারাজীবন।

বার্মিংহাম শহরে কিন্তু রোমান্সের গন্ধ নেই। এমন কি নিউক্যাসেল-অন-টাইন থেকেও একেবারে ভিন্ন পরিবেশ। ধূলো আর ধোয়া—চাবিদিকে কারখানার পর কারখানা। মালিকের গর্বোদ্ধত প্রাসাদের পিছনে শ্রমিকেব মলিন বস্তি।

স্কুল-জীবন শেষ হযে আসছে। বযস উনিশ। এইবাব ভর্তি হবেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযে। গ্রীষ্মের অবকাশে একদিন পিতাব সঙ্গে ভ্রমণে বার হয়েছেন। পিতা তাঁর মনেব আশা ব্যক্ত কবলেন। বললেন, ছেলে যদি তাঁকে অনুসরণ কবে ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ কবেন তাহলে তিনি খুশ হবেন। অ্যাণ্ড্রুজ কোনো উত্তব দিতে পাবলেন না,—কিন্তু সহস্র চিন্ত যে. এক সঙ্গে মূহূর্ত মধ্যে তাঁব তরুণ চিত্তকে মথিত কবে তুলল। ভিড় কবে এল শৈশব ও বাল্যেব ছোটোখাটো কতো ঘটন,—ছোটো বড়ে কত অন্যায় তিনি করেছেন, কত দুঃখ দিযেছেন, কত মিথ্যা বলেছেন,—তাব অনুতাপ।

ঈশ্বরেব কাজে জীবন ও জীবিকাকে আবদ্ধ কববাব দায কি সহজ দায়! কোথায় তাঁর মানসিক প্রস্তুতি, কতোটুকু তাঁব বিশ্বাস ও মনোবল? কখনো কি ভেবেছেন ঈশ্বরেব কথা? সামাজিক ধর্মোপাসনায যোগ দিযেছেন অবশ্য —কিন্তু সে তো সংস্কার মাত্র! ভক্তি কই, বিশ্বাস কই? কই নবজীবনেব পবিত্র মূলধন? আত্মপরীক্ষা কববেন তিনি কোন সাহসে? কে দেখাবে আত্মশোধনেব পথ?

পিতার অনুরোধ যেন বজ্রবাণী। এই বাণীকে হৃদয়ে গ্রহণ কববার শক্তি

কোথায় তাঁর? দিন কাটতে লাগল প্রতি মুহূর্তের অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায়। শেষে এলো এক আশ্চর্য রাত্রি,—সারাজীবনের অবিস্মরণীয় নিভৃত প্রহর,—যার বর্ণনা অ্যাণ্ড্রুজ নিজের ভাষাতেই করেছেন :

'বিছানায় শয়ন করতে যাওয়ার পূর্বে একলা ঘরের অন্ধকারে আমি প্রার্থনা করতে বসলাম। সহসা এই প্রার্থনার মধ্যে আমার বিবেকের সম্মুখীন হলাম আমি। আমার জীবনের সমস্ত পাপ সমস্ত অপবিত্রতা অচরিতার্থতার উপলব্ধি প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে আমার উপর ভেঙে পড়ল,—এক লহমায় ছিন্নভিন্ন করে দিল আমার মনের সমস্ত অহমিকা, সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ভান। সর্ব-আভরণহীন আমার উলঙ্গ সত্য-স্বরূপকে আমি চিনলাম। সে কি ভয়, সে কি যন্ত্রণা! নিভৃত অন্ধকারে হঠাৎ যেন একটি মাত্র বিদ্যুৎ-বিকাশ, একটি মাত্র বজ্রপাত,—তারপর কৃষ্ণ অঙ্গারের শুধু মাত্র পুঞ্জীভূত অন্ধকার। দুই হাতে মুখ ঢেকে নতজানু হয়ে বসে রইলাম,—সর্বস্বহারা হয়ে শুধু ঈশ্বরের কাছে আলোকের আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। কতোক্ষণ কেটে গেল জানি না। শেষ পর্যন্ত এক আশ্চয ও অপরিসীম শান্তিতে আমার প্রাণমন ভরে উঠল, মনে হোলো ঈশ্বরের অমৃত-করুণা ধীরে ধীরে আমার চৈতন্যের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত নিষিক্ত করে দিচ্ছে। আমার দুই চক্ষু জলে ভরে উঠল,—অন্তর পরিতৃপ্ত হোলো রোদন ধারায়। আমার সে মুহূর্তের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটুকু শুধু বলতে পারি যে সেই মুহূর্তে আমি সারাজীবনের মতো উপলব্ধি করলাম যে খৃষ্টই আমার ত্রাতা, আমার অনন্ত দেবতা। আমার প্রতি অন্তহীন তাঁর করুণা। তাঁর প্রতি সর্বসমর্পিত হোলো আমার জীবন,—তাঁর মঙ্গলস্পর্শে আমার অন্তরের সব অন্ধকার আলোকময় হয়ে উঠল।'

খৃষ্টের প্রসাদে এক নবজীবনে দীক্ষিত হলেন কিশোর অ্যাণ্ড্রুজ। প্রত্যুষে উঠে তিনি সেই প্রথম প্রভাতী প্রার্থনায় যোগদান করলেন। নতজানু হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রভাত-সূর্যের কিরণ-ধারার মতো তাঁর দেহমন অভিষিক্ত করল।

এক নূতন দৃষ্টি লাভ করলেন অ্যাণ্ড্রুজ। বাস্তব জগৎ এক নূতন রূপে চোখের সামনে ধরা দিল। ক্যাম্‌ডেন স্ট্রীটের বস্তীবাসীদের মধ্যে তিনি ঘুরতে লাগলেন, বিপন্ন শ্রমিকের ক্লিষ্ট মুখে তিনি দেখতে লাগলেন খৃষ্টের মুখচ্ছবি।

দুঃখদৈন্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এক গভীর কারুণ্যে মনকে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। মানববেদনার মর্মমন্দিরের পথ তিনি খুঁজে পেলেন। আশাহত বস্তির শ্রমিক পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলে এই কিশোরকালেই ঈশ্বরের যে রূপকে তিনি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করলেন,—সে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বিচারকর্তা নন, তিনি মানব করুণাই প্রতীক। সেবার মধ্যেই সে ঈশ্বরের আরাধনা।

৩

স্কুলের শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ করে ছাত্রবৃত্তি নিয়ে অ্যাণ্ড্রুজ উচ্চতর শিক্ষার জন্যে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। এখানে সমাজ ও ধর্মসম্পর্কিত বহুমুখী ধ্যানধারণা ও বিচিত্রগামী চিন্তাধারার সম্মুখীন হলেন তিনি। বাইবেলের প্রতিটি লাইন অ্যাণ্ড্রুজের সরল-প্রাণ পিতা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন। যীশুখৃষ্ট সশরীরে পুনরাবির্ভূত হবেন ও পুনরাবির্ভাবের আর দেরি নেই, এই সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে প্রতিটি দিনের প্রতীক্ষা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই আশ্চর্য দীক্ষার পুণ্য রজনীতে পুত্রের বিবেক তার প্রাণে এক প্রকৃততর উপলব্ধির ও আশার কথা বলেছিল। বলেছিল,—খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব কোন বিশেষ আসন্ন মুহূর্তের ঘটনা নয়। খৃষ্ট প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে নিত্য-আবির্ভূত,—প্রতি যুগে ভক্তের আত্মনিবেদিত অন্তরে তাঁর প্রকাশ। অ্যাণ্ড্রুজের এই নবজাগ্রত বিবেক খৃষ্টান সোশ্যাল ইউনিয়নের কর্মধারার মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পেল। অ্যাণ্ড্রুজ মনপ্রাণ দিয়ে এই ইউনিয়নের কেম্‌ব্রিজ শাখার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ডারহামের বিশপ ওয়েস্টকট ছিলেন খৃষ্টান সোশ্যাল ইউনিয়নের সভাপতি। বিশপ ওয়েষ্টকটের সঙ্গে ঘনিষ্ট হলেন তরুণ অ্যাণ্ড্রুজ।

বর্তমান যুগের নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার নিরসনে খৃষ্টধর্মের ও খৃষ্টীয় সত্যের পন্থাকে অনুসরণ করা ছিল এই খৃষ্টান সোশ্যাল ইউনিয়নের ব্রত। যুগে যুগে সামাজিক চেতনা প্রয়োজন ও সমস্যা বদলায়। ধর্ম যদি সত্য হয়,—তাহলে ধর্মের বাণীতে বিভিন্ন যুগের সমস্যার সমাধান, ধর্মের ইঙ্গিতে বিভিন্ন কালের পথনির্দেশ। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংরেজ সমাজ অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। যন্ত্রযুগ গ্রাস করছে পূর্ববর্তী যুগের উৎপাদনপ্রথা ও শ্রেণী-

বিন্যাস। সহস্র সহস্র গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন। তেমনি কলকারখানায় ও খনিতে লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িত শোষিত শ্রমিক। মালিকের মুনাফা যতো বাড়ছে ততো বাড়ছে শ্রমিকের দৈন্য। ব্যবহারিক জীবনে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের নিত্য সংজ্ঞা অনিত্যের ছায়াপাতে ধূসর থেকে ধূসরতর হতে চলেছে।

এই যুগের আশা-নিরাশা ভালোমন্দ পাপপুণ্যের মাঝখানে খৃষ্টবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ধর্ম শুধু ব্যক্তির মুক্তি-সাধনের পথসন্ধান মাত্র নয়, ধর্ম যুগসমস্যার সমাধানের পন্থা। খৃষ্ট শুধু ভক্তের অন্তর-দেবতা নন, খৃষ্ট ব্যষ্টির সার্থক জীবনের পথ-প্রদর্শক। এই ছিল খৃষ্টান সোশ্যাল ইউনিয়নের আদর্শ। এই আদর্শ ও কর্মধারার সঙ্গে যোগ দিয়ে অ্যাণ্ড্রুজ মনে মনে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। বার্মিংহামে শ্রমিক-জীবনের প্রতি আকর্ষণ এখন উদারতর শ্রমিক-কল্যাণের কর্মে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল। বিশপ ওয়েস্টকটের নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে সেবার মাধ্যমে খৃষ্টপ্রেমের আনন্দে তিনি আকুল হলেন। বাল্যে যেমন পিতার সঙ্গে তিনি বেড়াতে যেতেন তেমনি আজকাল ওয়েস্টকটের সঙ্গে তিনি ভ্রমণে বার হতে লাগলেন। সঙ্গে প্রিয়তম বন্ধু বিশপের কনিষ্ঠ পুত্র বেসিল।

অ্যাণ্ড্রুজের তরুণ জীবনে বিশপ ওয়েস্টকটের চিন্তা ও উপদেশ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ওয়েস্টকট অ্যাণ্ড্রুজকে শিখিয়েছিলেন যে খৃষ্ট শুধু গির্জার প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ নন,—মানব-ভাগ্যের সমস্ত সীমা-পরিসীমা জুড়ে খৃষ্টের আবির্ভাব। সমাজ-জীবনের সমস্ত সহযোগ ও সংঘাতে সমস্ত আলোক-অন্ধকারে খৃষ্টের উপলব্ধি। শুধু পূজার মধ্যে নয়,—কর্মের মধ্যে খৃষ্টের শুভস্পর্শকে অনুভব করতে হবে। প্রাচীন খৃষ্টভক্তগণ সেবার ও আত্মনিবেদনের পথে খৃষ্টের চরণে আত্মসমর্পন করেছিলেন, আধুনিক খৃষ্টান সমাজকে আবার সেই সহজ সরল মানবকল্যাণ ও সেবার অর্ঘ্য দিয়ে খৃষ্টের উপাসনা করতে হবে। বহু শতাব্দী পার হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ, গভীরতর হয়েছে সমস্যা, কৃষ্ণতর হয়েছে গ্লানি,—তাই এ যুগের খৃষ্টভক্তের সমাজসেবার দায়িত্বও বর্ধিত হয়েছে।

আধুনিক শিল্প-সমাজের তীব্রতম সমস্যা শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের পথেও খৃষ্টভক্তদের আগুয়ান হতে হবে।

ডারহামের কয়লা-শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। প্রায় আশি হাজার শ্রমিকের এই বিরোধের মীমাংসার জন্যে বিশপ ওয়েস্টকট এগিয়ে আসেন। খনি-শ্রমিকদের তিনি চিনতেন, ভালোবাসতেন। শ্রমিকরাও তাঁকে ভালোবাসত, বিশ্বাস করত। তাঁর মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত বিরোধের অবসান হয়। ওয়েস্টকটের কর্মজীবনের এই দিকটির প্রতি অ্যাণ্ড্রুজ সবচেয়ে আকৃষ্ট হন।

ভারতবর্ষের প্রতি অ্যাণ্ড্রুজের আকর্ষণের মূলেও ছিলেন ওয়েস্টকট। গ্রীসের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করতেন ওয়েস্টকট, বলতেন,—গ্রীস ও ভারতবর্ষ, এই দুটি দেশের চিন্তা ও সাধনাই পৃথিবীতে মানবসভ্যতার ভিত্তি-স্বরূপ। প্রতীচ্য সভ্যতার মূলে যেমন গ্রীস তেমনি এশীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ভারতবর্ষ। ওয়েস্টকটের অনুপ্রেরণায় দিল্লীতে কেমব্রিজ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অ্যাণ্ড্রুজ-সখা বেসিল ওয়েস্টকট এই মিশনের কাজে ভারতে যাত্রা করেন।

কেমব্রিজে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হোলো। ট্রাইপস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অ্যাণ্ড্রুজ প্রথম বিভাগে পাশ করলেন। এই সঙ্গে সম্মুখীন হলেন আর এক কঠিনতর পরীক্ষার।

এই পাঁচ বৎসরে অ্যাণ্ড্রুজ পড়েছেন অনেক, দেখেছেন অনেক, ভেবেছেন তারো বেশি। এইবার মনস্থির করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে সংকল্প। পৈত্রিক সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠী পরিত্যাগ করলেন অ্যাণ্ড্রুজ। ইংলিশ চার্চের উদারতর মতে তিনি দীক্ষিত হলেন। পিতার গির্জার দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল। এই চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের গণ্ডীর মধ্যেও তিনি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। সংস্কারের কোন সীমানার বাঁধনকে স্বীকার করতে পারেনি তাঁর পথিক-আত্মা।

৪

উইয়ার নদীর মোহনা। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ উত্তর-সাগরে পড়েছে এই নদী। সমুদ্রের ওপারে নরওয়ে। বহু শতাব্দী পূর্বে খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের আদিকালে

এই নদীর মোহনার উত্তর দিকের তীরে একটি গির্জা বানিয়েছিল সে যুগের খৃষ্টভক্তগণ। আর বানিয়েছিল একটি আলোকস্তম্ভ সমুদ্রচারী জাহাজের নাবিকদের সুবিধার জন্য।

তারপর অনেক শতাব্দী কেটেছে। বিদেশী দস্যুরা কতোবার এই গির্জা ধ্বংস করেছে। আবার নূতন করে গড়ে উঠেছে ধর্মমন্দির। বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খৃষ্টভক্তদের উপস্থিতিতে পবিত্র এই স্থান। গির্জার নাম মঙ্কওয়্যার-মাউথ।

এখন এখানে জাহাজ তৈরির বিরাট কারখানা। আগুন জলছে, লোহা তাতছে, অসংখ্য শ্রমিক কাজ করছে দিবারাত্রি। এখানকার প্রাচীন গির্জাটিতে অ্যাণ্ড্রুজ এলেন,—এখানকার ধর্মযাজকের অধীনে শুরু হোলো তাঁর শিক্ষানবিশী।

পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য,—কর্তৃত্ব সপ্তসমুদ্রের উপর। জাহাজের পর জাহাজ বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে নিয়ে আসছে অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদ কাঁচামাল। সেই কাঁচামালের বিনিময়ে আবার জাহাজে জাহাজে রপ্তানি হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রশিল্পে গড়া পণ্যদ্রব্য। এই আমদানি রপ্তানি সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ।

সুন্দর গির্জাটি। ছায়াঘেরা ফুলে-ভরা সবুজ প্রাঙ্গণ। ছবির মতো শান্ত মনোরম পরিবেশ। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে সমুদ্রগামী স্রোতস্বিনী।

সেই নদীর জল কিন্তু কৃষ্ণ-পঙ্কিল। দুধারে সারি সারি কারখানার পর কারখানা। বিরাট বিরাট জাহাজ তৈরি হচ্ছে। গনগনে আগুনে লোহার রিভেট গলে গলে টকটকে লাল হচ্ছে,—সেই রক্তাক্ত রিভেটের মালা পরে তৈরি হচ্ছে জাহাজের লৌহমূর্তি। এক একটা কারখানায় কাজ করছে দশ বারো হাজার করে লোক, কাজ করছে দিনে রাতে,—সময়ের কোনো হিসাব নেই, ক্লান্তির কোনো স্বীকৃতি নেই। শুধু কাজ, শুধু দ্রুততা,—কতো অল্প সময়ে কত অল্প ব্যয়ে কত বেশি কাজ করা যায়, কত উঁচু করে তোলা যায় মুনাফার পাহাড়। শ্রমিকের দল যেন মানুষ নয়, যেন যন্ত্রেরই অংশ। দৈনন্দিন খাটুনির অবসানে তারা টলতে টলতে কারখানা থেকে বার হয়,—মলিন দেহে জীর্ণ বস্ত্রে,—স্বাভাবিক মানবত্ব ও শক্তির শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত কারখানার মধ্যে নিংড়ে বিসর্জন দিয়ে। গুঁড়ি মেরে জন্তুর মত হাঁটে, আশ্রয় নেয় ভাটিখানায়। মদ আর জুয়ার মধ্যে তারা দিনান্তের ক্লান্তি আর ব্যর্থতার ওষধি খোঁজে।

অ্যাণ্ড্রুজ বলেছেন,—এই সাণ্ডারল্যাণ্ডে এসে ধনতন্ত্রের স্বরূপকে আমি প্রথম চিনলাম, বুঝলাম এই ধনতন্ত্রের সঙ্গে আপোষ জীবনে আমার সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মতো। সেখানে যতো আদর্শবাদের কথা শুনেছেন পড়েছেন আলোচনা করেছেন,—সে সব নিছক কথার কথা। এখানে এই নিপীড়িত নিত্য-বিড়ম্বিত শ্রমিক-সমাজের মধ্যে জীবনের রূঢ় প্রত্যক্ষের পরিচয়। ধর্ম এখানে উপদেশ নয়, মন্ত্র নয়, সংস্কার নয়,—ধর্ম এখানে সমাজোপলব্ধি, সমাজ-কর্ম। এদের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেমের বাঁধা বুলি আউড়ে কী হবে? যদি না এদের দুঃখবেদনার সমভাগী হওয়া যায়, এদের জীবনযাত্রার নিতান্ত কাছাকাছি এসে যদি না এদের জীবনক্ষতের যন্ত্রণাকে আপন হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়?

ধর্মযাজকের করুণায় অ্যাণ্ড্রুজ একটি ঘর পেয়েছিলেন। এই বাসস্থানের জন্যে কোনো ভাড়া লাগত না,—এটা হোলো মস্ত সুবিধা। জীবন-নির্বাহের অন্যান্য ব্যাপারে তিনি জাহাজ কারখানায় শ্রমিকের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেললেন। তাদের দারিদ্র্যই হোলো তাঁর ব্রত। সপ্তাহে দশটি মাত্র শিলিং তিনি নিজের জন্য ব্যয় করতে মনস্থ করলেন। এই সামান্য অর্থে কোনো কোনো দিন রাত্রের আহার জুটত না তাও স্বীকার।

শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর দিন কাটতে লাগল। তারা অনেকে তাঁর বন্ধু হোলো। শ্রমিক-রমণীদের স্নেহ বিশ্বাস তিনি অর্জন করলেন। ভালোই হোলো শিক্ষানবিশী। যীশুখৃষ্ট বলেছেন,—প্রতিবেশীকে প্রেম করো। এই দরিদ্র শ্রমিক-সমাজকে ভালোবাসতে শিখে খৃষ্টবাণীর মর্ম উপলব্ধি করলেন অ্যাণ্ড্রুজ।

পেমব্রোক কমিটির নির্দেশে অ্যাণ্ড্রুজ এবার গেলেন দক্ষিণ লণ্ডনের পেমব্রোক কলেজ মিশনে। এ অঞ্চলও প্রধানত শ্রমিক অঞ্চল, কিছু কিছু মধ্যবিত্তের বাস। এখানে শুরু হলো তাঁর শিক্ষানবিশীর দ্বিতীয় পর্যায়। এর পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মযাজকের সংকল্প গ্রহণ করবেন। মিশনের এই গির্জাতেই ধর্মযাজক পদে বৃত হবেন হয়তো।

অ্যাণ্ড্রুজের তরুণ জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি মাস দক্ষিণ লণ্ডনের এই এলাকায় কেটেছে। এখানকার পাঁচহাজার অধিবাসীর অধিকাংশই দীন দরিদ্র,—মালিক

ও বাড়িওয়ালার অত্যাচারে জর্জরিত। জাহাজী শ্রমিকদের মতো একই প্রকারের কঠোর দুরবস্থায় আবদ্ধ এখানকার লোকেরা। কিন্তু উত্তর লণ্ডনের লোকেদের মতো কঠোর কর্কশ নয় এরা,—এরা খোশমেজাজী হাসি-খুশি আমুদে। এরা দীন কিন্তু হীন নয়,—এরা দুর্ভাগা কিন্তু কলংকিত নয়। ভাগ্যকে এরা হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। তাই বঞ্চনার অন্ধকারেই প্রীতির প্রেমের আনন্দের আলোর এরা পিয়াসী।

লণ্ডনের শিল্পাঞ্চলে তরুণ অ্যাণ্ড্রুজ সৎ ও অসৎ, সাধু ও পাপী, ধর্মভীরু ও অপরাধী নানাপ্রকার নরনারীর সঙ্গে মিশলেন। গভীরতর হোলো তাঁর সমাজ-চেতনা; নিবিড়তর হোলো তাঁর সমাজ-প্রেম। সমাজের সমস্ত কলুষ আবরণের অন্তরালে সাধারণ মানুষের মর্মের মণিকোঠায় তিনি শুভ্র-উজ্জ্বল মৌলিক মানবত্বকে উপলব্ধি করলেন।

শিক্ষানবিশী শেষ হোলো,—পাকাপাকি ধর্মযাজকের পদে ব্রতী হলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে নূতন করে শুরু হোলো সুকঠিন আত্ম-জিজ্ঞাসা।

অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

'খৃষ্টকে আমি সন্ধান করতে চেয়েছিলাম শুধু মাত্র জীবন-পন্থারূপে নয়, সত্য রূপে। এর অর্থ এই যে কায়মনোবাক্যে আমাকে সৎ হতে হবে, সত্যের সঙ্গে কোনো আপোষ করা চলবে না। তবেই আমি সত্য-স্বরূপ খৃষ্টের প্রকৃত শিষ্য হতে পারব। ধর্মযাজক-বৃত্তির প্রতিটি আবেদনকারীকে 'বুক অব দি কমন প্রেয়ারের' নিয়মাবলীতে স্বীকৃতি দিতে হয়। এই নিয়মাবলীতে এমন কয়েকটি সূত্র আছে যার তলায় উন্মুক্ত বিশ্বাস নিয়ে সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মোটামুটিভাবে সমগ্র নিয়মাবলীতে সই আমি করলাম মানসিক দ্বিধা সত্বেও। কিন্তু এই সব নিয়ম আমি শেষ পর্যন্ত মানতে পারিনি। তখনই আমি বুঝেছিলাম,—দরিদ্র সমাজের মধ্যে আমি কাজ করব, এই আমার জীবনে ঈশ্বরের বিধান,—সেই বিধানে নিয়ম হবে শৃংখল মাত্র।'

একটি স্ত্রীলোক মদ খেত। এমন তার মদের নেশা যে বছরের পর বছর ধরে একটি দিনও সে মদ ছেড়ে থাকতে পারে না, দিনে রাত্রে একটি মুহূর্ত নেই যখন সে নেশায় চুর হয়ে না থাকে। একদিন প্রভাতী প্রার্থনার শেষে সে অ্যাণ্ড্রুজের কাছে এল। প্রচণ্ড মাতাল অবস্থা,—জড়িত কণ্ঠে বললে,—

বাবা, ভগবানের পথ দেখাও আমাকে। তরুণ ধর্মযাজক তাকে দূর করে দিলেন না। তিনি ভাবলেন,—এই তো প্রভুর উপযুক্ত সাধিকা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এরই তো সবচেয়ে প্রয়োজন। উন্মত্তা স্খলিতকণ্ঠা নারীর হাত ধরে পাশে বসিয়ে তার সঙ্গে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন। ভর্ৎসনা করলেন না, অনুযোগ করলেন না, বৃথা স্বীকারোক্তি বা অর্থহীন প্রতিশ্রুতি দাবী করলেন না। প্রার্থনার শেষে শুধু বললেন,—আবার কাল ভোরে এসো, দুজনে পাশাপাশি বসে কাল আবার আমরা প্রার্থনা করব,—কেমন?

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আশীষ-স্পর্শে আপন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় সেই স্ত্রীলোকটি মদের নেশা থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করল। অর্জন করল পুনর্জীবন। পরম-পিতা ঈশ্বরের করুণায় পরম-প্রভু খৃষ্টের স্পর্শে অভিষিক্ত হোলো এই কলংকবতীর ললাট,—যে দুর্লভ মহিমায় পরিপ্লুত হোলো তার ভাগ্য তার কাছে ধর্মসংস্কারের সমস্ত বিধান তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

আরো একটি দ্বিধা এল অ্যাণ্ড্রুজের মনে। যে খৃষ্টান নয়, যে খৃষ্টীয় ধর্মগণ্ডীর অন্তর্গত নয়, সে অভিশপ্ত, নরকে তার গতি—ধর্মযাজকের এই ঘোষণা তাঁর মুখে এসে আটকে যায়। এই ঘোষণা খৃষ্টের পরমসহিষ্ণু পরমপ্রেমের পরিপন্থী, এমনি ঘোষণা খৃষ্টের নিজস্ব 'সার্মন-অন-দি-মাউন্টে' কোথাও লেখা নেই।

সত্যশ্রয়ী অ্যাণ্ড্রুজের এই সংশয় শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মের সকল গণ্ডীর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল,—ধর্মযাজকবৃত্তি থেকে মুক্ত করে পরিব্রাজকের ধূসর ভূষণে ভূষিত করেছিল তাঁকে।

এদিকে অ্যাণ্ড্রুজ শুধু ধর্মযাজক নন,—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র,—মহাপণ্ডিত তিনি। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল অধ্যাপনার আমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন কলেজের ফেলোশিপ অস্বীকার করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তিনি কেম্‌ব্রিজে যেতে রাজি হলেন ও ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করলেন। এই সময়ে কয়েক বৎসর ধরে তিনি নিবিষ্টভাবে ধর্মের ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করলেন।

কিন্তু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অ্যাণ্ড্রুজের মন ভরে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত স্তব্ধ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তিনি তাঁর চেনা মানুষকে খুঁজে পান না।

সেই মানুষ বাস্তব জীবনযুদ্ধের সৈনিক, পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত তার অঙ্গ। পরণে তার মলিন পোষাক। শিল্পনাগরিক জীবনযাত্রার রূঢ় কঠোর পথে সেই মানুষকে তিনি চিনেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন,—সংস্কৃতির এই ছায়াভরা প্রাচীরঘেরা পীঠস্থানে সে কোথাও নেই।

অধ্যাপক হিসাবে অ্যাণ্ড্রুজ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করলেন,—ছাত্রমহলে তাঁর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর প্রাণে বাজতে লাগল পথিক-আত্মার আহ্বান। সে বলে,—চলো চলো, এই নিরুদ্বেগ নোঙরের বন্ধন ত্যাগ করে চলো,—অন্য কোথা,—অন্য কোনোখানে।

৫

১৯০৪ সালের ২০শে মার্চ তারিখে অ্যাণ্ড্রুজ ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। এই দিনটিকে অ্যাণ্ড্রুজ সারা জীবন স্মরণে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন,—ভারতভূমিতে তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন,—এই দিনটি তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন।

ভারতবর্ষের প্রতি অ্যাণ্ড্রুজের আকর্ষণ ছিল শিশুকাল থেকে। শৈশবে একদিন তিনি তাঁর জননীকে বলেছিলেন,—আমাকে রোজ বেশি করে ভাত খেতে দিয়ো। মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন,—কেন? অ্যাণ্ড্রুজ বলেন,—বাঃ! ভারতবাসীরা ভাত খায় যে! বড়ো হয়ে আমাকে ভারতবর্ষে যে যেতেই হবে!

কলেজ-জীবনে অ্যাণ্ড্রুজের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন বেসিল ওয়েস্টকট। বেসিল মিশনারী হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রতি অ্যাণ্ড্রুজের ঔৎসুক্য বাড়ে। বেসিলের চিঠিপত্রের মধ্য দিয়েই তিনি বিলাতে বসে তাঁর ভারতবর্ষের প্রথম বন্ধু সুশীলকুমার রুদ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। ছাত্রাবস্থায় প্রাচ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী হন অধ্যাপক ই জি ব্রাউনের শিক্ষায়।

মৃত্যুর উপর্যুপরি আঘাত কেম্ব্রিজের জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ শিথিল করে দিয়েছিল। কয়েকজন প্রিয় অধ্যাপক পর পর মারা গেলেন,—অব্যবহিত পরেই হারালেন ভগ্নী কাথলিনকে। এর পরে এল বেসিল ওয়েস্টকটের মৃত্যু-সংবাদ। সেবাব্রতী বেসিল ওয়েস্টকট দিল্লীতে একজন

কলেরা রোগীকে সেবা করতে গিয়ে নিজে ঐ কালরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিলেন। অ্যাণ্ড্রুজও মনে মনে ভাবছিলেন তিনিও স্বদেশ পরিত্যাগ করে বন্ধুর মতো মিশনারী হয়ে দূর প্রবাসে যাবেন। হয়তো যাবেন মধ্য আফ্রিকায়,— সেখানে খৃষ্টের নামে কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করবেন। বেসিলের আত্মদান তাঁকে পথের সন্ধান দিল। বেসিলের কর্মভূমি ভারতবর্ষকেই নবজন্মভূমি বলে তিনি গ্রহণ করলেন।

দিল্লীতে সেণ্ট স্টিফেন কলেজে মিশনারী অধ্যাপকরূপে যোগদান করলেন অ্যাণ্ড্রুজ। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ।

ভারতবর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্ড্রুজ প্রতীচ্যশক্তির সাম্রাজ্যবাদী মদমত্ততা ও বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত হিংস্রতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হলেন। তাঁরই স্বজাতির হাতে নিগৃহীত ভারত-আত্মার দৈনন্দিন অবমাননা তাঁর চিত্তে গভীর বিক্ষোভ সঞ্চার করে। যীশুখৃষ্টের করুণাঘন দৃষ্টিতে বর্ণান্ধতা নেই,— শাসক ও শোষিতের ভেদাভেদ নেই। কিন্তু এই ভেদদৃষ্টিতে মিশনারী সমাজও কলুষিত—তাই দেখে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে।

অ্যাণ্ড্রুজের ভারত-পরিচয়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সহায়ক বন্ধু সুশীলকুমার রুদ্র। ভারতীয় খৃষ্টান ধর্মযাজক পিয়ারীমোহন রুদ্রের পুত্র সুশীলকুমার রুদ্র তখন ছিলেন দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন কলেজের সহ-অধ্যক্ষ। বিলাতী মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতার জন্য তিনি ধর্মযাজক-পুত্র হয়েও ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ করেননি। মিশনারী কলেজে খৃষ্টান অ-মিশনারী অধ্যাপক ছিলেন ও শেষ পর্যন্ত প্রধান অধ্যক্ষের সম্মান লাভ করেছিলেন। বিনয় সত্যপরায়ণতা ও সাধুতা ছিল তাঁর অন্তরভূষণ। পরাধীনা দেশমাতৃকার বেদনা সর্বদা তাঁর অন্তরে বাজত। বৃটিশের তথাকথিত উদার সাম্রাজ্যবাদী শাসন কেমনভাবে ভারতের অর্থনীতিকে দিনে দিনে শোষণ করে ভারতবাসীকে নিঃশক্ত নীরক্ত করে তুলেছে, সরকারী শাসন ও বিচারের প্রহসন কেমনভাবে জাতি-অহমিকার অনাচারে ভারতবাসীকে নিষ্পিষ্ট করছে, তার প্রত্যক্ষ চিত্র সুশীল রুদ্রের কাছ থেকেই অ্যাণ্ড্রুজ প্রথম অবলোকন করেন। আবার এই ভারতবর্ষের সহজ সরল অগণিত অধিবাসীর বিনয়, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের সঙ্গেও অ্যাণ্ড্রুজ পরিচিত হন সুশীল রুদ্রের মাধ্যমে। ভারতের

শত শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির ও সাধনার ইঙ্গিতও অ্যাণ্ড্রুজ প্রথম লাভ করেন সুশীল রুদ্রের কাছ থেকে।

নিছক খৃষ্টধর্ম প্রচারের মিশনারী হবার উদ্দেশ্য নিয়ে অ্যাণ্ডজ ভারতবর্ষে আসেননি। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল মধ্য আফ্রিকাতে যাবার। সেখানকার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবার। বেসিল ওয়েস্টকটের আত্মদানই তাঁকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করে। অল্প দিনেই তিনি বুঝলেন যে বিদেশী মিশনারী ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই সুপ্রাচীন ভারত মহাদেশকে উপলব্ধি করা যাবে না, ভারতের অন্তর-দেবতার রুদ্ধ দ্বার বিদেশীর পরুষ করাঘাতে খুলবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম ও ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াসে অ্যাণ্ডজ ক্রমে তাঁর পরিবেশের গণ্ডী থেকে বার হয়ে এলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, ভারতবর্ষকে তাঁর আপন জন্মভূমি বলে গ্রহণ করতে হবে। বললেন,—এই ভারতভূমিতে নূতন করে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন,—এখানে তাঁর নবজন্ম লাভ হয়েছে। এমন সময় তাঁর পরিচয় হোলো সেই মহামানবের সঙ্গে, যিনি ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি, গীতাঞ্জলির উদ্গাতা,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বরণ করে নিলেন গুরুদেব বলে,—পদধূলি গ্রহণ করলেন তাঁর। রবীন্দ্র-আশ্রম শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সারাজীবনের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়লেন।

খৃষ্টান মিশনারী গণ্ডীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির প্রয়াসে আরো একজন মহাসাধক জ্ঞানকর্মীর আদর্শে এই সময়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। ইনি হলেন হরিদ্বার গুরুকুল কাংড়ির পরিচালক মহাত্মা মুন্সিরাম। মহাত্মা মুন্সিরাম ছিলেন আর্যসমাজী নেতা। গুরুকুল বিদ্যালয়ের প্রতি অ্যাণ্ড্রুজ আকৃষ্ট হলেন, মহাত্মা মুন্সিরামের সরল সহজ আশ্চর্য ব্যক্তিত্বে তিনি অভিভূত হলেন। গুরুকুলের শিক্ষাদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হলেন। ভারতের শস্য-সংস্কৃতিবাহিনী নদী জাহ্নবীকে মহাত্মা মুন্সিরাম মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন। এই পূজার মধ্যে অ্যাণ্ড্রুজ ভারতীয় অন্তরের গভীর মাতৃ-উপাসনাকে উপলব্ধি করলেন। মুন্সিরাম অ্যাণ্ড্রুজকে বললেন,—আমার এই পরমারাধ্যা মাতৃশক্তি সকলেরই মা,—সর্বদেশে সর্বজাতির সকল মানুষই তাঁর সন্তান, তাঁর ক্রোড়ে সকলেরই আশ্রয়।

আর্যসমাজী এই মাতৃসাধক সেবাব্রতীর বিশ্বাসের গভীরে অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর পরম-প্রভু খৃষ্টের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনলেন।

পঞ্জাবের এই গুরুকুল আশ্রমই অ্যাণ্ড্রুজকে বাংলাদেশের শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতি আকর্ষিত করে।

৬

ভারতবাসীকে অ্যাণ্ড্রুজ ভালোবেসেছিলেন খৃষ্টভক্ত মানব-কল্যাণব্রতীরূপে; দিল্লীতে মিশনের সংশ্রবে যে কয় বৎসর তিনি ছিলেন, ততোদিন ভারতবর্ষকে পুরোপুরি তিনি চিনতে পারেননি। আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন,—

'ভারত-আত্মার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে আমি কেবলই চাইছিলাম। এই অধরা রূপকে কখনো বা বুঝি দৃষ্টির বন্ধনে আমি বেঁধেছি, আবার চকিতে তা আমাকে এড়িয়ে গেছে। কখনো বা আমার আকাংক্ষিত ভারতবর্ষকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি পথের মানুষের মুখে—সেই মুখ আবার হারিয়েছি মুহূর্ত পরে। দিল্লীতে বসে ভারতবর্ষকে চিনতে আমি পারিনি। এখানে থাকতে শুধু বিদ্রোহ করেই আমার দিন কেটেছে,—সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—বিদেশী মিশনারী কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদেশী মিশনারী আমি হতে চাইনি. আমি চেয়েছি ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে। এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরম-প্রভু যীশুকে প্রকৃত মানব-পুত্র রূপে অন্তরে পেতে চাই, তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক প্রাণ এক আত্মা আমাকে হতে হবে,—বিদেশী বলে দূরে থাকলে চলবে না।'

কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর মধ্যে তাঁর অন্তরদেবতা খৃষ্টকে অ্যাণ্ড্রুজ চিনলেন। চেনালেন মহাত্মা গান্ধী। তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়গণ শ্বেতকায় রাজশক্তির রোষবহ্নিকে উপেক্ষা করে আত্ম-উদ্বোধনের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী তাদের দীক্ষাগুরু। সত্যাগ্রহ মন্ত্রের তিনি উদ্গাতা। গোখেলের প্রেরণায় অ্যাণ্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলেন। ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি পৌছলেন ডারবানে। পরিচিত হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে।

শ্বেতকায় শক্তির মুখোমুখি গান্ধীজীর পাশে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের মানবত্বের দাবী ঘোষণা করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে চুক্তিদাসত্ববদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকের দুর্দশা অ্যাণ্ড্রুজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন খৃষ্টপ্রেরণার চরম বিকাশ,—খৃষ্টোপম জীবনানুসরণের পরম প্রকাশ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে প্রদীপ যেমন জ্বলে,—অ্যাণ্ড্রুজ বলেছেন,—তেমনি তাঁর চরিত্রের যা কিছু নিযুপ্ত শুভবোধ তা গান্ধীজীর চরিত্রস্পর্শে জাগ্রত হয়েছে, গান্ধীজীর জীবনবেদে উজ্জীবিত হয়েছে তাঁর যা কিছু প্রেরণা। অ্যাণ্ড্রুজ বলেছেন, -'ঐ আকাশের তারকাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, তেমনি অবিনশ্বর চিরন্তন চিরনূতন সত্যের মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী।'

শ্বেতকায় প্রভুর অমানুষিক অত্যাচারের কশাঘাতে ভারতীয় শ্রমিকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত পিঠ,—তার ভয়ার্ত মুখে অ্যাণ্ড্রুজ দেখেছিলেন তাঁর পরম-প্রভুর যীশুখৃষ্টের মুখচ্ছবি। আফ্রিকার শ্রমদাসত্বের নিগড়বদ্ধ উৎপীড়িত ভারতীয় কুলিকে অ্যাণ্ড্রুজ সাধু খৃষ্টানের অমরমন্দিরের শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মহাযুদ্ধ যখন পৃথিবীতে ঘনিয়ে এল, তখন অ্যাণ্ড্রুজ এই বর্বর মানবতাধ্বংসী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ঘোষণা করলেন। তাঁর প্রভু খৃষ্ট তাঁকে আর এক মহত্তর যুদ্ধের সৈনিকরূপে আহ্বান করলেন, -যে যুদ্ধ পৃথিবীর সমস্ত অবজ্ঞাত নিপীড়িত অবহেলিত মানবের জন্য যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সৈনিক হয়ে তিনি বললেন, -খৃষ্টের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে কেই বা ইহুদী আর কেই বা গ্রীক, কেই বা আর্য আর কেই বা অনার্য, কেই বা খৃষ্টান আর কেই বা অখৃষ্টান? খৃষ্টান ধর্মযাজকের পদ তিনি পরিত্যাগ করেন,—স্বধর্মগোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেন, কেননা কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসের চোখে তিনি খৃষ্টের বেদনা-বিধুর ক্ষমাদৃষ্টিকে প্রতিফলিত দেখেছিলেন।

দিল্লীর মিশন পরিত্যাগ করে অ্যাণ্ড্রুজ আশ্রয় নিলেন শান্তিনিকেতনে। খৃষ্টান অ্যাণ্ড্রুজের উদার মানব-ভাবনা মূর্ত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গুরুদেব। ভারত-সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ যা কিছু গৌরবোজ্জ্বল তা তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ধর্মযাজকের পোশাক পরিত্যাগ করে তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির সময়ে অন্যতম উপাচার্যরূপে তিনি এই শিক্ষায়তনের কর্ণধার ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার পূর্বে ১৯১৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অ্যাণ্ড্রুজ সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখবার জন্য বোলপুর আসেন। সেইদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের প্রতিটি কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন কলেজ পরিত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের সেবায় যোগ দেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে ১৯৩৯ সালের খৃষ্ট-উৎসবের দিন অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনা করেন ও আশ্রমে তাঁর শেষ ভাষণ দেন। এই পঁচিশ বৎসর ধরে অ্যাণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শান্তিনিকেতনের পরমতম সুহৃদ ছিলেন।

বৃটিশ রাজ্যের আর এক কলোনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকরাও অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটায়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অ্যাণ্ড্রুজ মনে মনে এই সংকল্প করেছিলেন যে পৃথিবীর যেখানে যতো চুক্তিদাসত্ববদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক রয়েছে সকলের সেবা তিনি করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি গান্ধীর অনুগামী হয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে যোগদান করতে পারেননি। বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয় চুক্তিদাসদের দুঃখবেদনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি প্রথম তুলেছিলেন গোখেল ১৯১২ সালে। গোখেলই অ্যাণ্ড্রুজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এই মানবব্রতে। গোখেল আর নেই,—গোখেলের কাজ প্রত্যক্ষভাবে নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। এই কাজ খৃষ্টেরই কাজ, এই ব্রত খৃষ্টেরই নির্দেশ। রেভারেণ্ড জে ডব্লু বার্টন রচিত 'বর্তমান ফিজি' নামক গ্রন্থপাঠে অ্যাণ্ড্রুজ প্রথম সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার কথা জানতে পারেন। তারপর সরকারী ও বেসরকারী আরো তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন।

ভারত থেকে ছলে-বলে আড়কাটিরা বছরের পর বছর ফিজিতে শ্রমিক রপ্তানি করে। সেখানে বিভিন্ন বাগিচায় ভারতীয় শ্রমিকরা অবর্ণনীয় দুর্দশার

মধ্যে জীবন কাটায়। তাদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-জীবন কঠোর দাসত্বের নামান্তর। স্বস্তিহারা আশাহারা জান্তব জীবন—মনুষ্যত্বের সামান্যতম স্মরণচিহ্নও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবলুপ্ত। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাণ্ড্রুজ ফিজিযাত্রা করলেন। ফিজিপ্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে কোনো আন্দোলন নেই, কোনো নেতা নেই। একলা অ্যাণ্ড্রুজ, সঙ্গী উইলিয়ম পিয়ার্সন। এখানকার এই প্রবাসী ভারতীয়দের জন্যে ভারতে ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ যে আন্দোলনের সূচনা করলেন ও যে জনমতের সৃষ্টি করলেন, তার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়। ফিজির ভারতীয় সমাজের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির বহুমুখী কল্যাণ-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করেন অ্যাণ্ড্রুজ। ফিজিবাসী ভারতীয়েরাই প্রথম তাঁকে 'দীনবন্ধু' নামে অভিহিত করে।

৭

বিদেশে ভারতীয় শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশায় অ্যাণ্ড্রুজের প্রাণ কাঁদত,—কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি অ্যাণ্ড্রুজ অনবহিত ছিলেন না। ভারতের শিল্প-শ্রমিকরা আইনত চুক্তিদাস ছিল না, কিন্তু তাদের জীবনেও কলংক-কালিমা কম ছিল না। গ্রাম্যজীবন থেকে নাগরিক শিল্প-জীবনে শ্রমিক সম্প্রদায় আকর্ষিত হয়ে আসেনি। গ্রাম্য-জীবন তাদের ঠেলে দিয়েছে যে জীবনযাত্রায় সেখানে তাদের শোষণ ফিজির ইক্ষুবাগানের শ্রমদাসদের থেকে কম নয়। ভারতীয় কলকারখানার কুলি লাইনের দুরন্ত দুর্দশা নাটালের কুলি লাইনের থেকে কম নয়। এখানেও সেই দারিদ্র্য, সেই অস্বাস্থ্য ও কুশিক্ষা, সেই নৈতিক অবনতি। দক্ষিণ আফ্রিকা বা ফিজি যাবার দরকার নেই, আমাদের নিজের দেশের শিল্প-শহরগুলিতে মনুষ্যত্বের অবমাননার একই চিত্র দেখা যাবে!

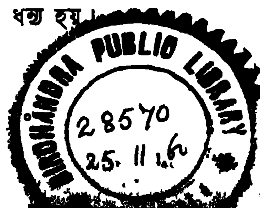
অ্যাণ্ড্রুজ চোখ বুজে ছিলেন না। স্বদেশে শ্রমিক-জীবনের মধ্য দিয়েই মানুষকে তিনি চিনেছিলেন,—ভারতবর্ষে এসে সেই মানুষকে হারাবার কথা তাঁর নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পোদ্যম প্রবল প্রেরণা লাভ করে,—শ্রমিক আন্দোলনও এই সময়ে শক্তি সংগ্রহ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের ও আশু পরবর্তী

কালের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা, রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থার প্রতিষ্ঠা—ভারতের শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনে এই ঘটনাবলী বিশেষ শক্তি জোগায়। মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে শুরু হয়, আরম্ভ হয় শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সংঘর্ষ। আমেদাবাদ বস্ত্র শিল্প-শ্রমিকদের আন্দোলনে ইতিমধ্যে গান্ধীজী নেতৃত্ব করেছেন। ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার আন্দোলনে মহাপ্রাণ অ্যাণ্ড্রুজও যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের জনক বি পি ওয়াদিয়ার আহ্বানে তিনি মাদ্রাজ বাকিংহাম কার্ণাটিক মিলের নবগঠিত শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব করেন। শ্রমিক ও মালিকের বিরোধের ফলে মালিক পক্ষ লক-আউট ঘোষণা করেন। অ্যাণ্ড্রুজের মধ্যবর্তিতার ফলে মালিক পক্ষ এই লক-আউট তুলে নেন ও ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেন।

অ্যাণ্ড্রুজ ভারতীয় শ্রমিক-জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে চান ও সেইজন্যে মাদ্রাজে শ্রমিক-লাইনে বাস করতে আরম্ভ করেন। শ্রমিকের দুঃখ-দৈন্যের উপশমের একমাত্র উপায় যে শ্রমিক-সংহতি তা তিনি উপলব্ধি করেন। বিদেশস্থিত ভারতীয় শ্রমদাসদের তিনি যে করুণা ও সহানুভূতি নিয়ে কাছে টেনেছিলেন, অন্তরের সেই স্নেহচ্ছায়ায় ভারতের দীন-দরিদ্র শ্রমিকদেরও তিনি টেনে নেন।

শ্রমিক-কল্যাণ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে অ্যাণ্ড্রুজ আসাম ও পূর্ববঙ্গ থেকে আরম্ভ করে দাক্ষিণাত্য ও সিংহল ও পঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র ভ্রমণ করেন ও নানা প্রদেশের নানা শ্রমিক-সংস্থার একান্ত বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে পরিগণিত হন। শ্রমিক-মালিকের বহু সংঘর্ষে তিনি স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মধ্যস্থের কাজ করেন ও মীমাংসার প্রচেষ্টায় নিরাসক্ত সত্যপরায়ণ শান্তিদূতরূপে উভয় পক্ষের অকপট সম্মান লাভ করেন। বিবদমান দুই পক্ষের মাঝখানে শান্তিস্থাপনের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কতোবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে,—কিন্তু সেই মহাবিপদকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। ১৯২৩ সালে তিনি জেনিভাস্থ আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা পরিদর্শন করেন। ১৯২৫ সালে এই ইংরেজ বিদেশীকে সভাপতি পদে বৃত করে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ধন্য হয়।



এই প্রসঙ্গে অ্যাণ্ড্রুজের আর একটি কর্মধারার কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে আসামে এক ছাত্র-সম্মেলনে অ্যাণ্ড্রুজ যোগ দেন এবং সেখানকার অহিফেন চাষ ও তার আন্তর্জাতিক কুফল সম্বন্ধে অবহিত হন। মিস্ লা মট রচিত 'অহিফেন মোনোপলি' নামক গ্রন্থ পাঠ করেও তিনি প্রাচ্য মহাদেশে এই সাংঘাতিক বিষদ্রব্য রপ্তানির ভয়াবহ কুফল সম্বন্ধে জানতে পারেন। মিস্ লা মটের সঙ্গে তিনি সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। দু-বৎসর আগে ১৯২১ সালে গান্ধীজী আসাম পরিভ্রমণ করেন ও অহিফেনের চাষ নেশা ও ব্যবসা সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু বৃটিশ সরকার সেই প্রতিবাদে কর্ণপাত করে না।

ভারত থেকে চীনদেশে অহিফেন রপ্তানি করা নিষিদ্ধ ছিল। নিষেধ আইনত হলেও হংকং সিঙ্গাপুর ব্যাংকক প্রভৃতি চীন ভূখণ্ডের নিকটবর্তী বন্দরে অসম্ভব পরিমাণে ভারতীয় অহিফেন যেত, এবং সেই সমস্ত বন্দর থেকে নিষিদ্ধ মূল্যে সারা প্রাচ্যভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ত। এই অহিফেন চাষ ও অহিফেন রপ্তানি ছিল সারা প্রাচ্য জগতে ভারতবর্ষের ঘৃণিত কলংক। মালয়ের বাগিচা-মালিকদের শ্রমিক-কল্যাণ কাযে উপদেশ দেবার জন্যে অ্যাণ্ড্রুজ আমন্ত্রণ পান এবং ১৯২২ সালে তিনি হংকং ও মালয়ে যান। এর কয়েক বৎসর আগে মরিশাস থেকে ডাক্তার মণিলাল তাকে নিমন্ত্রণ করেন সেখানকার ভারতীয় শ্রমিকদের অহিফেন সেবনের দুর্দশা দেখতে যাবার জন্যে।

এই নিষিদ্ধ অহিফেন রপ্তানির প্রত্যক্ষ কলংক তিনি দূরপ্রাচ্যে পরিদর্শন করেন। ইতিমধ্যে আসামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কংগ্রেসের পক্ষে পুংখানুপুংখ তদন্ত সম্পূর্ণ করেন। তারপর তিনি প্রস্তুত হন যুদ্ধের জন্য। এই যুদ্ধে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। এবং বণাঙ্গন লীগ অব নেশন্‌সের জেনিভা কন্‌ফারেন্স।

ভারত ও দূরপ্রাচ্যে অহিফেন চাষ ও অহিফেন রপ্তানির অমানবিক কলংকের সুদূরপ্রসারী কালিমা তিনি ব্যাপক ও গভীরভাবে লিপিবদ্ধ করলেন তাঁর রিপোর্টে। তথ্য ও ঘটনাসংস্থানে তাঁর নিশ্ছিদ্র রিপোর্টের মূল্য লীগ অব নেশনসের অহিফেন কন্‌ফারেন্স দিতে বাধ্য হলেন। এই সঙ্গে তিনি অহিফেন চাষ ও রপ্তানী সম্বন্ধে সারা পৃথিবীর জনমতকে একত্র করে ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে সংগ্রহ করে এই কন্‌ফারেন্সের সামনে রাখলেন। একমাত্র ঔষধ তৈয়ারীর প্রয়োজন ছাড়া অহিফেন চাষ যেন সম্পূর্ণ বন্ধ করে

দেওয়া হয় এই কথা নিয়ে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয়দের সই করা এক স্মারকপত্র পাঠালেন এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে।

চিঠিপত্র প্রবন্ধ আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতের জনমতকে দিনের পর দিন কশাঘাত করতে লাগলেন অ্যাণ্ড্রুজ। তিনি বললেন,—বিজাতির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অত্যাচার সাধন কখনো ভারত-আত্মার নীতি নয়। বিদেশী ভ্রাতাকে নেশার বিষ খাইয়ে তার পকেট থেকে পয়সা ছিনিয়ে আনার মতো হীন অপকর্ম ভারতবর্ষ কখনো করতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ ও জনসাধারণের এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন। সরকারী অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হোলো। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে অহিফেনের চাষ ও ব্যবস্থা সংক্রান্ত • ৭ হিতকর বি ।-নিষেধ প্রবর্তিত হোলো।

৮

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ যখন নাইট পদবী পরিত্যাগ করেন, তখন অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন কবিগুরুর পাশে। পঞ্জাবে বিদেশী শাসকের পশুশক্তি তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে,—জন্তুর হিংস্রতায় অত্যাচারের বন্যা বইয়েছে সেখানে। অ্যাণ্ড্রুজ স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ পঞ্জাব যাত্রা করলেন—অত্যাচারিতের পাশে গিয়ে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। শাসকশক্তির সামরিক আইন তাঁকে অমৃতসরে বন্দী করল, পঞ্জাব থেকে ফিরিয়ে দিল।

হাণ্টার কমিশন যখন বসল, তখন পঞ্জাবে বৃটিশ অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য কংগ্রেস কমিটি নেতৃত্ব করলেন, সেই কাজে যোগ দিলেন অ্যাণ্ড্রুজ। পঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে তিনি দিনের পর দিন ঘুরলেন। বিদেশী শাসকের চাবুকে পিঠে-রক্ত-ঝরা সাধারণ মানুষের সামনে তিনি নতজানু হয়ে বসলেন, বললেন,--গ্রন্থ সাহেবে গুরু নানক বলেছেন ক্ষমা করো,—ক্ষমা করো আমাকে—এ আমার পাপ !

সমস্ত ইংরেজ জাতির হয়ে অবমানিত উৎপীড়িত মানুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন তিনি।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করলেন যে সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর পরমতম শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ যীশুখৃষ্টের আদর্শের পরিপন্থী,—ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পেতেই হবে। গান্ধীজী তখন সর্বভারত জুড়ে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পঞ্চ-পরিকল্পনা প্রচার করেছেন,—অস্পৃশ্যতাবর্জন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন, নারী-উন্নয়ন, মদ্য-বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ। এই পরিকল্পনাগুলির মূলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন অহিংসার মূলমন্ত্র। অ্যাণ্ড্রুজ কায়মনোবাক্যে এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন। এই সমর্থনের পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল না,—ছিল ধর্মের নির্দেশ। তিনি ঘোষণা করলেন,—যে হেতু আমি খৃষ্টান সে হেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমার ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এই ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি হীন অস্পৃশ্য পদানত হয়ে থাকে তাহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য কী? যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ভারতবাসীর স্বপ্ন, যে স্বরাজ আমারও স্বপ্ন,—সেই স্বরাজ কেমন করে সত্য হবে যদি না ভারতের অনুন্নত সমাজ স্বরাজ পায়?

উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পদানত মানবতার দাবী নিয়ে অ্যাণ্ড্রুজ সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী ও গান্ধীজীর আদর্শকে প্রচার করেছেন ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়। শান্তিনিকেতন তাঁর আত্মার আশ্রম হলেও এখানে তিনি একসঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারেননি। দুর্গত মানুষের আহ্বানে ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁকে ভ্রমণ করতে হোতো। দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকা, ফিজি, মালয়, জাঞ্জিবার, বৃটিশ গায়না প্রভৃতি উপনিবেশে তিনি গেছেন বারে বারে সংগ্রাম করেছেন শ্রমিকের দাসত্ব মোচনের আয়াসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে। ভারত ও ভারতবাসীকে সমগ্র বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর ছিল অন্তহীন প্রেরণা। এই উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে ভারতের ইতিহাস সংস্কৃতি ও সাধনার কথা প্রচার করেছেন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের যাথার্থ্যের দাবীকে ঘোষণা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সম্পাদনা করেছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শ, জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত তিনখানি গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। মিস্ মেয়ো-রচিত কুখ্যাত গ্রন্থ 'মাদার ইণ্ডিয়া' পাঠের পর তিনি আমেরিকায় গিয়ে এই

গ্রন্থের রচয়িত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিবাদ-স্বরূপ 'ট্রু ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতবর্ষে মানুষের অবমাননা অ্যাণ্ড্রুজ দেখেছিলেন শ্রমিক কৃষক ও অস্পৃশ্যের প্রতি স্বদেশবাসীর ব্যবহারে। সমগ্র ভারতাত্মার অবমাননা তিনি দেখেছিলেন জাতীয় পরাধীনতায়। কিষাণ-মজদুরের বন্ধু তিনি ছিলেন,—তাদের জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে ও তাদের মূক কণ্ঠের ভাষাকে আপন কণ্ঠে গ্রহণ করে। দক্ষিণ ভারতের অচ্ছুতের তিনি ছিলেন পরম সখা, মেটিয়াবুরুজের শ্রমিকের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু, বিহারের ভূমিকম্পে এবং বাংলা ও উড়িষ্যার বন্যায় ভাগ্যহত কৃষাণের বেদনায় রক্তাক্ত হয়েছিল তাঁর হৃদয়। যেখানে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবিদ্বেষ, তাঁর শাসন সেখানে ছিল অনিবার।

গান্ধীজীর প্রিয়তম সুহৃদ ছিলেন তিনি, জাতীয় কংগ্রেসের সম্মানী উপদেষ্টা। ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতি আগ্রহান্বিত হলেন এবং তার দু-বৎসর পরেই ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরজির স্বরাজের দাবীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এইখানে তাঁর সঙ্গে গোখেলের সঙ্গে পরিচয় হোলো ও এই পরিচয় তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করল। প্রদেশ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের আন্দোলনের প্রতি তাঁর লক্ষ্য পড়ল। গোখেল তাকে আকৃষ্ট করলেন প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যায় প্রতি।

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হোলো তখন ভারতবর্ষের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন ছিল বৃটেনের স্বপক্ষে। যুদ্ধ শেষ হোলো। ১৯১৮ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ হোলো। সেই সঙ্গে পাশ হোলো রাউলাট আইন। গান্ধীজী আন্দোলন শুরু করলেন। বৃটিশ সরকার সেই আন্দোলনকে হত্যা করল প্রচণ্ড বর্বরতায় যার বীভৎসতম নিদর্শন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। ভারতের নিপীড়িত নির্যাতিত পরাধীন মানুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন অ্যাণ্ড্রুজ।

সেই দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে ভারতের

স্বাধীনতা-আন্দোলনের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠতম। জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় নেতারা প্রতি পদক্ষেপে অ্যাণ্ড্রুজের উপদেশ ও সহায়তা লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। নিজস্ব বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। কী রাজদ্বারে কী গণমানবতীর্থে রিক্ত পরিব্রাজকের বেশ ছিল তাঁর। খৃষ্টান ধর্মযাজকের পদ পরিত্যাগ করে তিনি বলেছিলেন যে তার পরম-প্রভু খৃষ্ট তাঁকে সর্ব গণ্ডী থেকে মুক্ত করে সীমানাহীন বিশ্ব-সমাজে পরিব্রাজকের অনন্ত যাত্রায় প্রেরণ করেছেন। এক সোভিয়েট দেশ ও দাক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি যাননি।

পরম বন্ধু গান্ধীজী সম্বন্ধে অ্যাণ্ড্রুজ লিখেছেন,—,সামান্যতম প্রাণ যেখানে নির্যাতিত,—সেখানেই তাঁর অনন্ত মমত্বভরা প্রাণ ছুটে গেছে। এমনিভাবে অবিরাম ছুটে ছুটে তাঁর দুঃখ-সন্ধানী আত্মা বিরামহীন আবেগে সেই অনির্বচনীয়কেই সন্ধান করেছে,—যাঁর নাম সত্য, যাঁর অপর নাম ঈশ্বর।

এই কথা একান্তভাবে অ্যাণ্ড্রুজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁর প্রিয়বন্ধুজন নানা প্রিয় নামে তাঁকে ডাকত,—'ওয়াণ্ডারিং খৃষ্টান এই নামটি তিনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন।

এই কপর্দকহীন নিত্য-ভ্রাম্যমান বিশ্ব-পথিককে কে জোগাতো পাথেয়? কে দিত খাদ্য ও বস্ত্র? কে মিলাতো আশ্রয়? জোগাতেন ঈশ্বর। ভক্ত বন্ধুরা তাকে পোশাক দিয়েছে,—সেই পোশাক তিনি পথের ভিখারীকে দিয়ে রিক্ত-বস্ত্র হয়ে বিচরণ করেছেন। দীনের হাতে কতোবার শেষ মুদ্রাটি তুলে দিয়ে দীনতম হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন। কখনো কোথাও রাজার সম্মান পেয়েছেন,—কোথাও আবার দুর্গতি ও বিপদের বন্ধুরতম পথে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছেন একা। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন,—তাঁর মধ্যে মানবকল্যাণের মূর্ত আত্মাকে দেখে ধন্য হয়েছেন। আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায় তাঁকে ঘিরে বলেছিল,—আপন শুধু এই প্রতীচ্য সভ্যতার জন্যে প্রার্থনা করুন,—যে প্রার্থনা আমরা ভুলেছি সেই প্রার্থনার ভাষা আমাদের শিক্ষা দিন।

ভারতবর্ষ অ্যাণ্ড্রুজের পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনাবলীর পর একজন ভক্ত তাঁকে শ্রদ্ধাবিহ্বল অন্তরে বলেছিল,—ভারতবর্ষ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। অ্যাণ্ড্রুজ উত্তরে বলেছিলেন,—বৎস, ভাবতবর্ষেব কাছেই কৃতজ্ঞ আমি,—আমাব জীবন-সাধনা ভারতবর্ষের কাছেই আমি পেয়েছি।

১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে কলকাতা শহরে অ্যাণ্ড্রুজ দেহরক্ষা করেন। শেষ রোগশয্যাব পাশে উপবিষ্ট গান্ধীজীর কানে কানে তিনি বলেন,—মোহন, স্বরাজের আব দেরি নেই, এ আমি স্থির দেখতে পাচ্ছি।

তাঁর মৃত্যুদিনে কলকাতায় মেট্রপলিটান বিশপ বলেন,—সর্ববিক্ত হয়ে দান করার চেয়েও বড়ো দান আছে। সেই দান পবিপূর্ণ আত্মদান।

তেমনি দাতা ছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ।

১০

সি এফ অ্যাণ্ড্রুজের বচনাবলীব মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম What I Owe to Christ,—খৃষ্টচরণ-নিবেদিত পথিক-আত্মাব এ এক আশ্চর্য আত্ম-জীবনী। ১৯ ৮ সালে ইংলণ্ডে অ্যাণ্ড্রুজ এই গ্রন্থ রচনা করবেন বলে মনস্থ করেন,—তিন বৎসর পরে এই গ্রন্থ বচনা সম্পূর্ণ হয ও ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

এই তিন বৎসরের মধ্যে অ্যাণ্ড্রুজ ববীন্দ্রনাথেব চারখানি ও মহাত্মা গান্ধীব তিনখানি বই সম্পাদনা কবেন। মিস্ মেয়োব 'মাদাব ইণ্ডিয়ার' উত্তবে 'ট্রু-ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের খসডা আরম্ভ কবেন। এ ছাড়া এ সময়ে কতো যে প্রবন্ধ ও পত্রাবলী লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিলাত থেকে মিস্ মেয়োব সঙ্গে দেখা করবার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের আসন্ন আগমনের প্রস্তুতির জন্যে কানাডায়। সেখান থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বৃটিশ গায়নায়। ১৯২৯ সালের খৃষ্টমাসের সময় সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নিগ্রো সম্প্রদায়েব মধ্যে বসে অ্যাণ্ড্রুজ

What I Owe to Christ-গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদগুলি নিয়ে কাজ করছেন। তখন ভারতবর্ষে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হয়েছে।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে ফিরে অ্যাণ্ড্রুজ আসন্ন রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর মূল যুক্তিকে স্বদেশবাসীর কাছে উপস্থিত করবার জন্যে তিনি দু-মাসের মধ্যে লিখলেন 'ভারত ও সাইমন রিপোর্ট'। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনরায় গেলেন আমেরিকায়। পিছনে পিছনে এল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্বের আহ্বান। আবার ইংলণ্ড হয়ে গেলেন ট্রান্সভাল। এপ্রিল ১৯৩১-এ ইংলণ্ডে ফিরে এসে আসন্ন রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে গান্ধীজীর আগমনের প্রস্তুতির কাজে নিজেকে নিযুক্ত করলেন। তখন তাঁর ব্যাগের মধ্যে সারা পৃথিবীর অসংখ্য ঠিকানা থেকে আসা উত্তর-না-লেখা অজস্র জমানো চিঠি, 'মহাত্মা গান্ধীর ব্রত' নামক পুস্তকের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, একগাদা অর্ধসমাপ্ত প্রবন্ধ আর What I Owe to Christ-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা গান্ধী যখন ইংলণ্ডে এলেন তখন অ্যাণ্ড্রুজের একমুহূর্তের বিশ্রাম নেই। সরকারী বেসরকারী মহলে গান্ধীজীকে পরিচয় করানো,—ইংলণ্ডের প্রদেশে প্রদেশে গান্ধীজীকে পরিভ্রমণ করানো,—দিনরাত্রি ধরে অসংখ্য চিঠি পত্র লেখা ও ঐতিহাসিক দলিলপত্র পড়া,—মুহূর্তের ক্ষান্তি নেই। গান্ধীজী যে বাড়িতে থাকতেন সেইখানেই অ্যাণ্ড্রুজের বাসা হলো। সেই বাসার একটি ছোট কুটরিতে বসে বসে ক্ষণিক অবসরে এক এক লাইন করে এগোতে লাগল What I Owe to Christ। ব্যর্থ রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের পর গান্ধীজী ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতে ফিরলেন ও তার তিন সপ্তাহ পরে কারারুদ্ধ হলেন। ভবঘুরে খৃষ্টান অ্যাণ্ড্রুজ তখন আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে What I Owe to Christ গ্রন্থ প্রকাশিত হোলো। পনেরো দিনের মধ্যে দুটি সংস্করণ শেষ হয়ে ছাপা আরম্ভ হোলো তৃতীয় মুদ্রণ। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে খৃষ্টান ও অখৃষ্টান শত সহস্র মানব-প্রেমিককে এই গ্রন্থ কর্ম ও ভক্তির আনন্দিত আবেগে উদ্বুদ্ধ করেছে,—

মানব-জীবনের গভীরতর রহস্যের প্রতি আকর্ষিত করেছে। ভারতের নিহিত আত্মার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই গ্রন্থের মাধ্যমে অ্যাণ্ড্রুজ বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—এই ভারত-ভূমিতে আমি নবজন্মলাভ করেছি। ভারতবাসীর সঙ্গে এক প্রাণ এক আত্মা হয়ে ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলে প্রাচ্যের এই মহাকাশতলে আমার পরম-প্রভু যীশুকে প্রকৃত মানবপুত্র রূপে অন্তরে লাভ করেছি। ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—আমার সমস্ত জীবনকে ঘিরে রয়েছে ঈশ্বরের যে ভালোবাসা আমার পরম-পিতার যে পরম প্রেম, সেই প্রেম তার নিত্য অঙ্গুলি-নির্দেশে আমাকে চিরন্তন অনন্ত সত্যের পথে পরিচালিত করে চলেছে,—শান্তম্ শিবম্ অমৃতম্—এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই অনন্ত অখণ্ড সত্যের পথে আমাকে পরিচালিত করেছেন।

১৯৩২ এর আগস্ট মাসে অ্যাণ্ড্রুজের গুরুদেব এই গ্রন্থ পাঠ করেন। এই গ্রন্থ বিশ্বকবিকে 'শিশুতীর্থ' কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে,—যে কবিতায় মানবপুত্রের অমোঘ উচ্চারিত বন্দনাগান,—জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

পৃথিবীর মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরাজির মধ্যে এই What I Owe to Christ গ্রন্থের স্থান। যীশুখৃষ্টের একটি সহজবোধ্য জীবনী রচনার ইচ্ছাও অ্যাণ্ড্রুজের ছিল। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত এই ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন। মানবপ্রেমিক বিশ্বপরিব্রাজক অ্যাণ্ড্রুজ এই রচনা সম্পন্ন করবার সময় ও সুযোগ তাঁর নিত্যব্যস্ত কর্মময় জীবনে করে উঠতে পারেননি।

খৃষ্টের জীবনীগ্রন্থ অ্যাণ্ড্রুজ রচনা করতে পারেননি,—খৃষ্টোপম জীবন তিনি যাপন করে গেছেন।

১১

পরিশেষে অনুবাদকের স্বল্প নিবেদন। ১৯৩২ সালে এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমার কিশোর কাল। সেই নবকৈশোরের এক জন্মদিনে অ্যাণ্ড্রুজের এই What I Owe to Christ গ্রন্থটি আমার মাতৃদেবী আমাকে উপহার দেন। তারপর আটাশ বৎসর কেটেছে,—ক্ষণস্থায়ী কৈশোর পার হয়ে আজ

যৌবনও প্রায় অতিক্রান্ত। এই সুদীর্ঘ আঠাশ বৎসর ধরে এই গ্রন্থটি আমি বারে বারে পাঠ করেছি,—আগ্রহ-ব্যর্থতা ভরা আমার অকৃতার্থ জীবনের সংকীর্ণ-সর্পিল যাত্রাপথে এই গ্রন্থ আলোকবর্তিকারূপে আমাকে পথ দেখিয়েছে। কৈশোরের চাপল্য ও যৌবনের বিভ্রান্তির মাঝখানে জীবনের সহজ সাধনায় নিত্য অঙ্গুলি-সংকেত করেছে এই গ্রন্থ। আজ এই আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে আমার কর্মজীবন আমাকে স্থাপন করেছে শিল্প-শ্রমিক সমাজের প্রত্যক্ষ পটভূমিকায়। তাদের আশা-আকাংক্ষা, শ্রম ও বেদনা, ব্যর্থতা ও বঞ্চনার আমি প্রতিদিনের সাক্ষী। আজও বারে বারে এই গ্রন্থ আমি পাঠ করি ও পাঠ করি দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের জীবনী। যে নিত্য-শ্রমদায়ী ও নিত্য-শোষিত সমাজের ভালোমন্দের সঙ্গে আমি জড়িত, সেই সমাজের সেবার মধ্যে নবপ্রেরণা আমি লাভ করি।

অ্যাণ্ড্রুজের What I Owe to Christ গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশ তাঁর ভারতে আগমন হতে শুরু। এই অংশের অনুবাদ 'ঋণাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হোলো। জীবনের যা কিছু চরিতার্থতা তা অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর পরম প্রভু-খৃষ্টের কাছ থেকেই লাভ করেন। তাঁর জীবনই তাঁর পরম প্রভুর চরণে তাঁর ঋণাঞ্জলি।

এই গ্রন্থ অনুবাদের ইচ্ছা যখন আমি কয়েকজন পরম সুহৃদের কাছে ব্যক্ত করি, তাঁরা আমাকে সর্বভাবে উৎসাহিত করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ থেকে হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের সেবিকা অ্যাণ্ড্রুজ-জীবনী-লেখিকা শ্রীমার্জরি সাইক্‌স আমাকে আশীর্বাদ করে লেখেন—"It is very good that such a translation should be in the hands of one who has drawn inspiration as you have from this book, it will then convey the right spirit." অ্যাণ্ড্রুজ ও গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রাথমিক আন্দোলনের যুগের বন্ধু হেনরি পোলক তার মৃত্যুর কয়েকমাস আগে লণ্ডন থেকে পত্র লিখে আমার এই অনুবাদ-কার্যে সমর্থন জানান। মূল ইংরাজি গ্রন্থের প্রকাশক লণ্ডনের হডার ও স্টটন লিমিটেড সানন্দে বিনা রক্ষাকবচে এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-স্বত্ব আমাকে দান করেন। এই 'পুণ্যস্মৃতি' ভূমিকার রচনায় বেনারসীদাস চতুর্বেদী ও মার্জরি

সাইক্‌স্‌ রচিত অ্যাণ্ড্রুজ-জীবনী থেকে প্রধান তথ্যগুলি আমি সংগ্রহ করেছি।

আমার অনুবাদ সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সাইক্‌স্‌ যে আশা পোষণ করেছেন তা সফল করতে পেরেছি কি না বলতে পারি না। তবে এই অনুবাদ যখন ধারাবাহিকভাবে একটি জনপ্রিয় মাসিকপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বহু সুধিজনের প্রশংসা ও তৃপ্তির নিদর্শন লাভ করেছিল।

এই অনুবাদ আমার আনন্দ-কর্ম। কোনো আপাত লাভের আশায় আমি এই তর্জমায় ব্যাপৃত হইনি। সোদরোপম প্রকাশক-ভ্রাতা সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থরূপে এই রচনাকে প্রকাশ করে আমার এই আনন্দ-প্রয়াসকে সার্থক করেছেন।

অ্যাণ্ড্রুজ যে বয়সে এই রচনা সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই বয়সেই এই অনুবাদ আমি করলাম। তিনি ছিলেন স্রষ্টা, আমি মাত্র তর্জমাকার। প্রতি মুহূর্তের বিপুল কর্মময় মহাজীবনে তাঁর পরম-প্রভু খৃষ্টের পরেই যে দুইজন অ্যাণ্ডজকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁরা তাঁর জনক-জননী। গ্রন্থের শেষে তাঁদের তিনি প্রণাম নিবেদন করেছেন ও তাঁদের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। আমিও আমার স্বর্গতা মাতৃদেবীর মধ্যে ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখেছি,—এবং আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে আজও আমার সম্মুখে নিত্য বিরাজ করছেন আমার নিঃস্বার্থপ্রেমী কল্যাণব্রতী পিতৃদেব,—কর্ম ও বৈরাগ্যের সমান্তরাল যুগলধারা যাঁর জীবনায়নের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে দুর্লভ সার্থকতা লাভ করেছে আমার অকিঞ্চিৎকর মানবভাগ্য।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ঋণাঞ্জলি

মুক্তিদাস

ও এল হামাগুড়ি দিয়ে
শিকারীর হাতে ঘা-খাওয়া জন্তুর মতো।
কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত
রক্তঝরা হাত আর পিঠ, -
চোখে ওর ভয়ার্ত দৃষ্টি।
আমার সমস্ত প্রাণ ছুটে গেল ওর দিকে,
নয়নে এল ব্যাকুল অশ্রুজল।
আর, সহসা এ কী আমি দেখলাম ?
এ কী বিস্ময় ?
ওর ঐ ক্লিষ্ট চোখের মাঝে
প্রতিভাত হোলো
তোমারই মুখ—
হে আমার দুঃখ-বেদনাব পবম-প্রভু,—
তোমরা অনির্বচনীয় নিত্যরূপ।

—আগুজ

ভারতে আমার নবজন্ম

এই পৃথিবীতে আমি দুইবার জন্মলাভ করেছি। আমার জন্মদিন একটি নয়,—দুইটি। আমার দ্বিতীয় জন্মদিন পরম-কারুণিক সর্বমঙ্গল-দাতা ঈশ্বরের এক অপূর্ব দান। গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমার জীবনের এই আশ্চর্য দ্বিতীয় জন্মদিনটিতে আমি ঈশ্বরের চরণে কৃতার্থ প্রণাম নিবেদন করেছি। এই দিনটির তারিখ ২০শে মার্চ। ১৯০৭ সালে এই শুভদিনে আমি প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করি, —প্রাচ্য জগতে আমার নবজীবনের সূচনা হয় এই দিনে।

উত্তর-ভারতের অধিকাংশ ভাষার একটি অতি পরিচিত শব্দ,—দ্বিজ। দ্বিজ মানে যে দু-বার জন্মলাভ করে। এই বিচিত্র বিশেষণটি আমার সম্বন্ধে একান্তভাবে প্রযোজ্য। সত্যই আমি দ্বিজ।

আমার জীবন দুটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত। আমার অর্ধেক জীবন প্রতীচ্য জগতের, বাকি অর্ধেক প্রাচ্যের। প্রাচ্যের ধ্যান ও পাশ্চাত্যের ধারণার যেটুকু যোগসূত্র আমি রচনা করতে পেরেছি,—তার মূলে রয়েছে আমার এই দ্বিখণ্ডিত জীবন-রহস্য।

প্রথম যেদিন ভারতভূমিতে আমি ভূমিষ্ঠ হলাম, সেদিনটি অবিস্মরণীয়। অভাবনীয় সেদিনের অভিজ্ঞতা। স্পষ্ট মনে হোলো সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন জগতে আমি যেন অবতীর্ণ হলাম। এ জগতের মানুষ অন্য, মানবচিন্তা অন্য। এই অপরিচিত অন্য জগতে পদে পদে বিস্ময়, তেমনি পদে পদে সংশয়। জাতিতে জাতিতে সংস্কারের ও বাহ্য সংস্কৃতির যতো বিভেদই থাক, মানবচরিত্র যে মূলত এক,—তা আমি সে মুহূর্তে উপলব্ধি করিনি। প্রতীচ্যের মানুষ আমি,—প্রাচ্যের প্রত্যক্ষ বৈচিত্র্য আমার দু-চোখ শুধু ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেইদিন।

তারপর প্রাচ্য-ভূখণ্ডে আমি জীবনের ত্রিশ বৎসর কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ফলে আমার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপরে নব নব উপলব্ধির আসন রচিত হয়েছে। এই উপলব্ধির ফলে আমার ধর্মবোধ মহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানব-পুত্র খৃষ্টের প্রতি আমার বিশ্বাস হয়েছে গভীরতর। সেই খৃষ্টকে আমি শুধু আমার আপন হৃদয়ের কেন্দ্রে নয়, সর্বমানবের সুখ-দুঃখের তীর্থমন্দিরে আসীন রূপে দেখতে পেরেছি। আমার দৃষ্টি সূক্ষ্মতর হয়েছে,—আবার সেই সঙ্গে আমার দর্শন পৃথিবীর সর্বত্র বিসর্পিত হয়ে গেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পরিবেশেই খৃষ্টকে আমি দেখেছি,—এশিয়া ও ইউরোপে যা কিছু মহান যা কিছু গরীয়ান, —তারই প্রতিভূরূপে আমার প্রভুকে আমি অবলোকন করেছি।

এতোদিন শুধু প্রতীচ্য পৃথিবীর সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। ইউরোপের পরিবেশে যীশুখৃষ্টের যে রূপ আমি দেখেছিলাম সে রূপে সম্পূর্ণতা ছিল না। পাশ্চাত্য আদর্শ নিয়ে তাঁর যে চিত্র আমি মনে মনে এঁকেছিলাম, তার রেখাংকনে ছিল দুর্বলতা। প্রাচ্য আকাশের বর্ণাঢ্য পটভূমির সামনে খৃষ্টকে আমি নূতন করে দেখেছি,—তাই সহজে বুঝতে পেরেছি দুর্বলতা কোথায়! মানব-পুত্রের যে চিত্র এতোদিন প্রতীচ্য এঁকেছে তাতে অনেক রেখা আর অনেক রঙ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে,—অপ্রকট থেকে গেছে তাঁর চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য। আমার মনে বাসনা আছে,—নূতন করে তাঁর প্রতিকৃতি আমি একদিন আঁকব, তখন আমার তুলিতে মাখিয়ে নেব পূর্বগগনের বর্ণালী।

কেন না, খৃষ্ট-চরিত্রের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যই যে এইখানে,—এই অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্যে। পৃথিবীতে কতো বর্ণ, কতো জাতি। সর্বজাতির সমস্ত গুণাবলী যীশুর চরিত্রে স্থান পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য মানব-ইতিহাসের আর কোনো দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যে পাওয়া যায় না,—খৃষ্ট অদ্বিতীয়। প্রাচীন মানব-সংস্কৃতির দুটি স্রোতোধারা, একটি বয়ে

চলেছে পূর্বে আর একটি পশ্চিমে,—এই দুই স্রোতের প্রয়াগ-সংগমে তাঁর আবির্ভাব। মানব-পুত্র যীশু,—মানব সভ্যতার এক আশ্চর্য কেন্দ্রে এক আশ্চর্য মুহূর্তে ঈশ্বরের আশ্চর্য আদেশে মানব-সন্তানরূপেই তিনি জন্মলাভ করেছেন। তিনি পাদস্পর্শ করেছেন মানব-সংসারে, আবির্ভূত হয়েছেন সর্বমানবমর্মের মাঝখানে।

সর্বমানবের প্রতিভূ যীশু,—এ দাবী অতি বৃহৎ দাবী। বিগত যুগে এতো বড়ো ঘোষণা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু বর্তমান যুগে তা সম্ভব হয়েছে। মানুষে মানুষে অপরিচয়ের দূরত্ব অধুনা অনেক কমেছে। পৃথিবীর নানা জাতির সংস্পর্শে এসেছেন, নানা মত ও নানা ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন,—এমন মানুষ আজ বিরল নয়। এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে যীশুর বাণী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই অন্তর স্পর্শ করে, সকলেরই শুভ জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলে যায়। ইতিহাসের কত যুগ কেটে গেছে,—পৃথিবীতে কতো জাতি, কতো সম্প্রদায়, কতো বর্ণ,—কিন্তু খৃষ্ট-চরিত্রের স্বর্ণসূত্রজালে সর্ব লোক আর সর্ব কাল ঈশ্বরের বরণমাল্যের মতো গাঁথা।

যুগের পর যুগ যায়। প্রতি যুগে ভক্ত প্রশ্ন করে,—কে ঐ ঈশ্বর-প্রেরিত মানব-পুত্র? সর্বমানবের নিবিষ্ট প্রাণের পরম আকুতির উত্তর কেবল একটি মাত্র মানব-চরিত্রের মধ্যেই মেলে। তিনি যীশুখৃষ্ট।

ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার পর এই গভীর ও আনন্দময় উপলব্ধি আমার মনে এসেছে। সেই সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধেও এক নূতন উপলব্ধি আমার মনে জাগরূক হয়েছে।

ইংলণ্ডে যতোদিন ছিলাম, ততোদিন এই জানতাম যে ঈশ্বর তিনি,—যিনি সর্বস্রষ্টা সর্বাধিনায়ক। ধর্মপুস্তকে যা লেখা আছে, তা এতোদিন আবৃত্তি করেছি,—'আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, যিনি আমাদের পিতা, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি স্বর্গমর্ত্যের স্রষ্টা।' এই শিক্ষা অনুসারে

ঈশ্বরের যে চিত্র আমার কল্পনায় অংকিত হয়ে গিয়েছিল তাতে ঈশ্বরকে আমার অন্তরলোকের দেবতারূপে আমি পাইনি। সেই ছবিতে দেখেছি —ঈশ্বর এক প্রচণ্ড বিরাট পুরুষ, অতুলনীয় তাঁর শক্তি,—সেই শক্তিতে চালিত হচ্ছে বিশ্বচরাচর—সর্বশক্তিমান সর্বভাগ্যবিধাতা রাজাধিরাজ তিনি।

ঐ ভয়ংকর ক্ষমতার যিনি অধীশ্বর, ভয়ানক তিনি,—ভয় করতেই হবে তাঁকে। এটা অবশ্য ঠিক যে, তিনি আমাদের পিতা। এই সম্পর্কটুকুর জন্যেই ঐ মহাভয়ংকরের প্রতি ভয়ভাব কিছুটা কমেছে, স্বীকার করেছি তাঁর মহান্ পিতৃত্ব, আশ্রয় নিয়েছি তাঁর শক্তিছায়ায়।

ভারতবর্ষের হৃদয়ের গভীরে যখন প্রবেশ করলাম,—দেখলাম সেখানেও বসে রয়েছেন ঈশ্বর। এ ঈশ্বর কোন বাহ্যিক পরমশক্তিমান দেবতা নন,—ঈশ্বর অন্তরের ধন। সম্ভ্রমে নয়, ভয়ে নয়, আত্মার গভীর ধ্যানে তাঁর আনন্দ-মোহন উপলব্ধি। ঈশ্বরের এই অন্তর্যামী রূপ দেখে ভয় করে না—শুধু এক বিচিত্র পুলকে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের এ এক আশ্চর্য রূপ!

এই রূপমাধুরীর উপলব্ধি যখন আমার মনে গভীর হোলো, তখন সাধু জনের উপদেশাবলী আমি নূতন করে বুঝতে পারলাম,—প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে যা আমার হয়নি। যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন,—'আমি আর ঈশ্বর এক।' বুঝলাম, এ কথা শুধু খৃষ্টের নয়,—এ প্রতি মানুষেরই দাবী। ঈশ্বর অন্তরীক্ষের দেবতা নন,—ঈশ্বরে আমাতে কোনো দূরত্ব নেই,—কেননা আমি ঈশ্বরেরই সন্তান।

অব্যয় অক্ষয় অনন্ত যে পরমাত্মা, মানবাত্মার মধ্যেই সেই পরমাত্মার আশ্রয়,—প্রাচ্যমন এই কথা বিশ্বাস করে। তিনি অসীম, কাল থেকে

কালান্তরে তিনি বিস্তৃত,—স্থান-কালের সীমায় তিনি আবদ্ধ নন। কিন্তু স্থান-কালের বসন তিনি পরিধান করেন আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে। তিনি নিরবয়ব নির্গুণ, কিন্তু তিনি অপ্রত্যক্ষ নন। পুণ্য মানবাত্মার সুনির্মল চিৎদর্পণে তাঁর প্রকাশ। তিনি অদৃশ্য, কিন্তু পূত মানব চরিত্রে তাঁর দর্শন-আভাস মানস-কমলের মতো প্রস্ফুটিত। তিনি অমূর্ত, এই মানবদেহেই তিনি মূর্তি পরিগ্রহ করেন।

এইভাবেই প্রাচ্য দেশ ঈশ্বরকে ধ্যান করেছে। ঈশ্বরের এই আন্তরিক অভিনিবেশ প্রাচ্যের রচনায় ও সংকেতে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের সরল গ্রামবাসীও এই অপূর্ব ধর্মবিচিন্তার অধিকারী। প্রতিমা পূজার বাহ্যিকতার গভীরে এই ধ্যান-মন্দাকিনী প্রবাহিত।

পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই গোলার্ধের মিলনেই এই পৃথিবী-গ্রহে মানব-ভাগ্যের সম্পূর্ণতা। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, বাহির ও ভিতর,—এই দুই ধারণাকে একায়িত না করলে খৃষ্টকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না, —যে খৃষ্ট একাধারে দেবতা ও মানুষ। এই সত্য আমি ধীরে ধীরে হৃদয়ংগম করেছি।

গোঁড়া খৃষ্টান তত্ত্বসন্ধানী যে ভাবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের প্রভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রগত অধ্যয়ন ও আলোচনা করে প্রাচ্যের ধর্মমত সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন, সে ভাবে জ্ঞান আহরণ আমি করিনি। ভারতীয় ধর্ম-পরিবেশ চারিদিক থেকে আমার জীবনযাত্রাকে ঘিরেছে। দিল্লীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাকে পদে পদে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন করেছে। কঠোর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পথে আমাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। পাছে ভুল করি পাছে পরম-প্রভু খৃষ্টের প্রকৃত অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হই এই চিন্তা নিয়ে আমি আগুয়ান হয়েছি। এই অগ্রগমনের মধ্য দিয়েই আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। প্রভু যীশুকে প্রণাম করে, তাঁর উপাসনা করে এই

প্রাচ্যভূমিতে তাঁরই নির্দিষ্ট পথে আমি এক পা এক পা করে চলেছি,—দিনে দিনে নূতন করে উপলব্ধি করেছি, যে তিনিই পথ, তিনিই সত্য,—তিনিই মহাজীবন !

বেসিল ওয়েস্টকটের শ্রেষ্ঠবন্ধু সুশীলকুমার রুদ্র আমাকে দিল্লীতে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা করলেন। সেণ্ট স্টিফেন কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল তিনি। তাঁর সাহায্যে আমার অনেক অসুবিধা দূর হোলো। পূর্ব-জগতে নবজাত আমি,—নূতন পরিবেশের অপরিচয়েব বাধা তাঁর সাহায্যে ক্রমে ক্রমে মোচিত হতে লাগল। তিনি আমারও পরম বন্ধু হলেন।

ভারতবাসীকে আমি এতো সহজে চিনলাম কী করে, ভারতবাসীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা এতো নিবিড়ভাবে আমি লাভ করলাম কী করে এই ভেবে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু কারণটা অতি সাধারণ, এর মধ্যে আশ্চর্য হবার মতো কোনো রহস্য নেই। এর কারণ সুশীল রুদ্র,—তাঁর মতো বন্ধু লাভ জীবনে দুর্লভ। আমি বেসিলের বন্ধু,—এই সুবাদে তিনি আমাকে প্রথমে কাছে টানেন, তারপর অতি সহজেই আমি তাঁরও বন্ধু হয়ে যাই। সারা জীবনের সুহৃদ। তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন আমার পরিচয় হোলো তখন তাঁর মধ্য বয়স অতিক্রান্ত। বেশি বয়সে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর তিনটি সন্তানেরই তখন বয়স অল্প। কোলের শিশু পুত্রটিকে রেখে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন।

আমরা একসঙ্গে বসবাস শুরু করলাম। এই সংসারে শিশুগুলির একমাত্র আপন জন ছিল তাদের পিতা,—পিতার পরেই অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে তারা অভিষিক্ত করল আমাকে। ভারতবর্ষে পৌছনো মাত্র ভারতীয় পরিবারে স্থান পাবার ও পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়জনরূপে গৃহীত হবার দুস্প্রাপ্য সৌভাগ্য আমি পেয়েছিলাম। এ যুগের ভারতীয় জীবনযাত্রা কতো প্রাগ্রসর তা বাহির থেকে বোঝা যায় না,—আমি সেই

জীবনযাত্রাকে একেবারে ভিতর থেকে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলাম। নবীন ভারতের নব চিন্তাধারার সঙ্গে সুশীলের মাধ্যমেই আমি পরিচিত হয়েছিলাম,—সেই সঙ্গে তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের দীপ্তি আমারও মনকে উদ্দীপিত করেছিল। দেশপ্রেমিক বলতে সাধারণত যা বোঝায় সুশীল সেই রকম দেশপ্রেমিক ছিলেন না,—তাঁর সংস্কৃতির কেন্দ্রে ছিল দেশভক্তি। তা ছাড়া তাঁর গভীর খৃষ্টভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ,—এই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শ্রেষ্ঠ আত্মিক বন্ধন। এই জন্যেই তাঁর সৌহার্দ্য ছিল আমার অমূল্য সম্পদ। খৃষ্টকে প্রভু বলে জীবনদেবতা বলে সুশীল তাঁব সমস্ত জাবন খৃষ্টেব চরণে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গম্ভীর ধর্মবোধ নিঃশব্দ-ভাবে তাঁর প্রতিদিনের কর্ম ও প্রতি মুহূর্তের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও শ্রীমণ্ডিত করত। স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল নবীন অন্তর দিয়ে তিনি খৃষ্টবিশ্বাসকে অন্তরে বরণ করেছিলেন।

সুশীলেব পিতা পিয়ারীমোহন রুদ্র তাঁর প্রথম যৌবনে কলকাতায় ডাক্তার ডাফের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ডাফ সাহেব তখন তাঁর কর্মক্ষমতাব শীর্ষদেশে। তাঁর আহ্বানে একদল শিক্ষিত তরুণ গোঁড়া হিন্দু সমাজ থেকে বহির্ভূত হয়ে প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। সে যুগে এমনি ঘোষণার অর্থ সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সমাজ থেকে নির্বাসন। ধর্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই যুবকদের কয়েকজন আপন সমাজেব ভালোমন্দ সব কিছুকেই বর্জন করলেন। দেশ্য জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাঁবা। খৃষ্টানুরক্তির সঙ্গে সঙ্গে আচারে ব্যবহারে বসনে ব্যসনে তাঁরা সর্বতোভাবে প্রতীচ্যকে অনুকরণ করতে লাগলেন।

সুশীলের পিতা কিন্তু খৃষ্টানুরক্তিব এই অর্থ ববেন নি। এই সমাজ-বহির্ভূত পরানুকৃত জীবনধারাই যে খৃষ্টোপাসনার অঙ্গ, তা নিজে যেমন তিনি বিশ্বাস করেননি তেমনি নিজের সন্তানদেরও তিনি এমন শিক্ষা দেননি। সামাজিক জীবনেব আচারে ব্যবহারে তিনি হিন্দুই ছিলেন,—শুধু তাঁব অন্তর্জীবন খৃষ্টীয় বিশ্বাসের প্রেরণায় রূপান্তর লাভ করেছিল।

হিন্দু সমাজের বিরাট ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক সম্ভ্রম সুশীল তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

তরুণ জীবনে সুশীলকে সংশয় ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর সমস্যা আর আমার সমস্যা একই প্রকারের না হলেও আমারও জীবনে তাঁরই মতো অন্তর্দ্বন্দ্ব এসেছে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে বাস করতেন। সেখানকার নীরব বিশ্বাস ও বিনম্র প্রার্থনার মাধুর্যমণ্ডিত জীবনযাত্রা তাঁকে তৎকালীন সমাজের অবিশ্বাসের ক্ষুব্ধ ঝটিকা থেকে আশ্রয় দিয়েছিল। অকুতোভয় মানসিক স্থৈর্য ও অকৃত্রিম বিশ্বাসের বলে তিনি তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সুশীল যখন দিল্লীতে আসেন তখন তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত। ততোদিনে তাঁর মনে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয়েছে যে খৃষ্টই তাঁর ত্রাতা তাঁর রক্ষাকর্তা। এখানে তাঁর কর্মজীবন ধর্মভাবের নবদ্যোতনায় উদ্বুদ্ধ হোলো, --নূতন করে তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করলেন। যীশু বলেছেন, --'আমিই জীবন, আমিই পুনরুজ্জীবন।' এই বাণী সুশীলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিল। আমারও ত্রাতা যীশুখৃষ্ট, --আমি আর সুশীল সমবিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলাম।

ভারতবর্ষে নব আগন্তুক আমি। আমারও জীবন নব নব অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র পরিবর্তনের সম্মুখীন। সেই বিচিত্র ক্ষণে সুশীলের মতো মহৎ প্রাণের পবিত্র ও আন্তরিক ভালোবাসা ঈশ্বরের মহার্ঘ দান রূপে আমি লাভ করেছিলাম। সুশীলের মতো বিনয়ী লোক আমি দ্বিতীয় দেখিনি। শান্ত অথচ সুগম্ভীর সম্ভ্রমমণ্ডিত তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছোট বড়ো প্রতিটি কাজ প্রতিটি আচার-ব্যবহার এক বিনম্র মর্যাদায় ভূষিত।

তাঁর সামনে কেউ কোনো নিরর্থক চপল বাক্য উচ্চারণ করত না, কিন্তু তাঁর সামনে কোনো প্রকার বিব্রতবোধ বা ভয়ও কেউ অনুভব করত না। তাঁর কাজে বা কথায় কেউ কখনো আঘাত পায়নি। তাঁর হৃদয়-মাধুর্যে সকলেই ছিল অভিভূত। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বৎসর কালের মধ্যে আমার প্রতি তাঁর প্রীতির কখনো কোনো হ্রাস বা বিকৃতি ঘটেনি।

প্রতিদিন আমরা দু-জনে ভ্রমণ করতাম,—হয় কাশ্মীর গেট ছাড়িয়ে রীজ ধরে, না হয় দিল্লী কেল্লা বা হুমায়ুন-সমাধির অভিমুখে। কোনো সময় আমরা শহরের ভিড়ের পথে ঢুকে হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম। কখনো বা যমুনা নদীর পুল পার হয়ে আমরা ওপারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। ভারত-ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন সুশীল। এমনি ভ্রমণের সময়ে সুশীল দেশের গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এই সব আলোচনা আমার খুব উপকারে আসে। এই শিক্ষার ফলে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের গ্রাম-সংস্কৃতির একজন উৎসাহী সমর্থক হই। কেবল শহর দেখে ভারতকে চিনতে যাওয়ার যে মহা ভুল, এই জন্যেই সেই ভুল পথ আমি এড়াতে পেরেছি।

দৈনন্দিন দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে সুশীল ও আমার পরস্পরের চেনাশোনা ও বন্ধুত্বের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে। আমাদের উভয়েরই বন্ধু ছিল বেসিল ওয়েস্টকট, বেসিলের স্মৃতি নিয়ে অনেক কথা আমরা আলোচনা করতাম। বেসিলের ভগিনী কেটি থাকতেন ইংলণ্ডে,—সুদীর্ঘকাল ধরে রোগাক্রান্তা। রোগশয্যা থেকে তিনি সুশীলের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতেন। এই কেটির কথাও আমরা প্রায়ই বলতাম। সুশীলের মাধ্যমে অপরিচিত ভারতবর্ষকে আমি সহজে চিনতে শিখি। তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা দেখে আরো অনেক ভারতীয় আমার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সুশীলের মাধ্যমে ভারতীয়দের সঙ্গে আমার পরিচয় বিস্তৃত হয়। সুশীলই আমার ভারত-দর্শনের প্রথম উদ্যোক্তা,—তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

এই ভারতবর্ষে এসে অবধি এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমি পদে পদে বারে বারে উপলব্ধি করেছি। এই অভিজ্ঞতা এতোবার আমাকে স্পর্শ করেছে যে একে আমার আর এখন আশ্চর্য বা অভাবনীয় বলে মনে হয় না। এখানে যখনই আমি কোনো নূতন লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বা কোনো নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি,—তখনই নিতান্ত অপ্রতিরোধ্য ভাবে যীশুখৃষ্টের উপস্থিতিকে যেন আমি অনুভব করেছি। এই অনুভূতিকে সহজভাবে প্রকাশ করা শক্ত। স্থূলভাবে যদি বলতে হয় তাহলে এই কথাই বলতে পারি যে, বিভিন্ন নূতন লোকের মুখে আমি খৃষ্টকেই দেখেছি,—প্রতিটি নূতন পরিবেশের মধ্যে অনুভব করেছি যে খৃষ্ট সেখানে বিরাজমান।

আমি স্থির জানি এ হোলো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির কথা, - ভাষা দিয়ে একে প্রকাশ করা না। কিন্তু ভারতীয় জীবনের মূলে আমায় এই অলৌকিক খৃষ্টোপলব্ধিকে এমনি সোজাসুজি ভাবে ছাড়া বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভারত-চেতনার মর্মমূলে খৃষ্টের প্রকাশ,—এই প্রকাশ ভারতের সঙ্গে আমার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনি। বরং এরই ফলে ভারত ও ভারতবাসী অতি সহজে আমার এতো আপন হয়ে উঠেছে।

এই উপলব্ধির সার্থকতম নিদর্শন সুশীলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে। যীশু,—যিনি মহান মানব, মহান পালক,- তাঁর যে মুখ শিশুকাল থেকে আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে, সেই মুখের প্রতিচ্ছবি সুশীলের মুখে আমি দেখেছিলাম। তাছাড়া কেবল বাইরের চেহারাতে নয়, অন্তরেও সুশীল ছিলেন খৃষ্টেরই মতো,—তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে খৃষ্টের অন্তর-মাধুর্য প্রকাশ পেত।

অবিলম্বে আমাদের বন্ধুত্ব এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হোলো। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইংরেজ মিশনারী। তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। অধ্যক্ষের পদে আর একজন ইংরেজই যে বৃত হবেন তা স্বয়ংসিদ্ধ। এমনই ছিল তখনকার প্রথা। সুশীল আমাকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে বললেন। এ প্রথা আমি কিন্তু কিছুতেই সমর্থন করতে পারলাম না। কুড়ি বৎসরের অধিককাল সহ-অধ্যক্ষের পদে আসীন রয়েছেন সুশীল তাঁর নিজের দেশের এই শিক্ষায়তনে। তিনি অধ্যক্ষ হতে পারবেন না, তাঁকে অতিক্রম করে অধ্যক্ষের পদ পাবে একজন নূতন বিদেশী,—শুধু ইংরেজ, এই অধিকারে ? এ বড়ো অন্যায় ! আমি এই প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ করলাম এবং সুশীল যাতে অধ্যক্ষ পদ পান, তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। মিশনের অন্যান্য অনেক অভিজ্ঞ সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত আমার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোলো। সুশীল হলেন অধ্যক্ষ,– তাঁর অধীনে কাজ করবার পরম সৌভাগ্য আমি লাভ করলাম। এ না হোলে কত বড়ো ভুল করা হোতো তা এখন বুঝতে পারি। অচিরেই প্রমাণিত হয়েছিল যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন সুশীল।

সুশীল রুদ্রের মতো দিল্লীতে আরো অনেকে ছিলেন,—যাঁদের সান্নিধ্যে আমি খৃষ্টের সান্নিধ্য অনুভব করেছি। বিশেষ করে সাধুপ্রাণ বৃদ্ধ মুসলমান মুন্সী জাকাউল্লা নিবিড়ভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করে-ছিলেন। অনুপম তাঁর চরিত্র, শান্ত-সমাহিত ব্যবহার। তাঁর পরিচয় আমি বিস্তারিতভাবে অন্য একটি গ্রন্থে লিখেছি।

মুন্সী জাকাউল্লা আমাকে পুত্র বলে ডাকতেন,—পুত্রজ্ঞানে আমাকে স্নেহ করতেন। এক সময়ে তাঁর সনির্বন্ধ আহ্বানে প্রত্যেক দিন তাঁর বাড়িতে আমাকে যেতে হোতো। প্রতিদিন আমাকে কাছে পেতে তাঁর

যেমন আগ্রহ ছিল, তাঁর সঙ্গলাভের জন্যে আমারও তেমনি ছিল প্রতিদিনের উদ্‌গ্রীবতা। আমার সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে তিনি বড়ো ভালো বাসতেন। আমরা খোলাখুলি আলোচনা করতাম উভয়ের ধর্মের কথা। কিন্তু তাঁকে ধর্মান্তরিত করার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্যও কখনো আমার মনে জাগে নি। তিনি অখৃষ্টান,—কিন্তু তাঁর মধ্যে আমি খৃষ্টকে বিরাজমান দেখতাম। তাই তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার আনন্দের অবধি ছিল না।

এক মুসলমানের সঙ্গে একজন খৃষ্টান মিশনারীর এমনি ঘনিষ্ঠতা অথচ যার মধ্যে বিধর্মীকে খৃষ্টান ধর্মমতে দীক্ষিত করার কোনো উৎসাহ বা চেষ্টা নেই,—এমনি সম্পর্ক সেদিনে নিতান্ত বিরল ছিল। অন্য মুসলমানদের পক্ষে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে ভুল বোঝার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু স্থশীলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এ ব্যাপারেও আমার সহায় হয়েছিল। অখৃষ্টানকে খৃষ্টান ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আনার জন্যে স্থশীলের যে কোনো ব্যাকুলতা নেই বরং এমনি ধর্মান্তরিতকরণের পন্থাকে স্থশীল যে অপছন্দ করেন তা দিল্লীর সকলেই জানত। আমি স্থশীলের বন্ধু,—অতএব স্থশীলের প্রতি যে আস্থা তার কিছু অংশ আমারও ভাগ্যে জুটেছিল।

দিল্লীর আর এক-বন্ধুর কথা স্মরণ করি। ইনি একজন শিখসর্দার, পাতিয়ালার রিজেন্সী কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট। তাঁকেও আমি অনুরূপ শ্রদ্ধা করতাম তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের জন্যে। ধর্মের গভীর রূপ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হোতো, ধর্মমত নিয়ে তর্ক হোতো না। ঈশ্বর-প্রেমে তর্কের স্থান নেই। আমার সাহচর্য তিনি খুবই কামনা করতেন এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের বন্ধুত্ব অতি গভীর হয়েছিল। যখনই তাঁর কাছ থেকে আমি বিদায় নিতাম, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আবার দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে নিতেন পুনর্বার দেখা হলে। তাঁর স্বরচিত কয়েকটি ভক্তিমুলক উর্দু-গ্রন্থ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

এই দু-জন পরম ধার্মিক বৃদ্ধ বহুদিন হোলো শান্তির ক্রোড়ে চির আশ্রয় লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আমার মর্মমুকুরে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের কথা লেখবার সময় তাঁদের প্রীতি-উদ্ভাসিত মুখ যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার ভাব পাঞ্জাবের বিভিন্ন মিশন কেন্দ্রে অচলিত ছিল না। এই পরধর্ম-অসূয়াকে আমি ঘৃণা করতাম। আমি একলাই যে প্রগতিবাদী ছিলাম তা নয়, কেম্‌ব্রিজ মিশনের কয়েকজন তরুণ সদস্যের মনোভাবও এ বিষয়ে উদার ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের অনেক মিশনারী একেবারে ভিন্ন আদর্শের লোক ছিলেন। রক্ষণশীলতা আর উদারনীতির অনিবার্য মতবিরোধ মাঝে মাঝে উত্তপ্তরূপ ধারণ করত। তখন মিটমাটের জন্যে মাঝখানে এসে দাঁড়াতেন আমাদের বিশপ, — তিনি ছিলেন মধ্যপন্থাচারী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের জন্যে বিশপ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনি যুদ্ধে জয়লাভ করে একজন অন্ধ মৌলবীকে তিনি খৃষ্টান করেছিলেন বলে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে সেদিন আর নেই,—যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও দরকার।

এই ভারতবর্ষ তখন আমার কাছে নিতান্ত অপূর্বজ্ঞান, সম্পূর্ণ নূতন। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ধর্ম, —সম্যক পৃথক পরিবেশ। এই অনৈক্যকে আপন করে নেবার মতো কতোটুকু মানসিক প্রস্তুতি আমি সঙ্গে করে এনে-ছিলাম? ইয়র্কশায়ারের প্রান্তরে বিশপ ওয়েস্টকটের সঙ্গে ভ্রমণকালে যে উদার উপদেশবাণী তাঁর কাছ থেকে আমি লাভ করেছিলাম, সেই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। প্রাচীন খৃষ্টধর্মের সংস্কারবিহীন আদর্শকে ভারতবর্ষে প্রচার করবার উদ্দেশ্য ছিল কেম্‌ব্রিজ মিশনের। এই মিশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশপ ওয়েস্টকট। তাই বিদেশে এতো ইংরেজ মিশনারী গিয়েছেন, তাঁদের অনেকের চেয়েই

অধিকতর সংস্কার-বিমুখতার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। অধ্যাপক ঈ জি ব্রাউনের কাছ থেকেও আমি অনেক শিক্ষা ও উৎসাহ লাভ করেছিলাম। অধ্যাপক ব্রাউন ছিলেন আমাদের কলেজেরই সদস্য। প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। ভারতে আসার পূর্বে তাঁর কাছে আমি প্রায়ই যেতাম, প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহভরা আলোচনা পরম আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। তাঁর শিক্ষাতেই আমি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হই। এই শিক্ষা দিল্লীতে আসার পর আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল।

পূর্ব-প্রস্তুতি কিছুটা থাকলেও মনের মধ্যে বিকৃত সংস্কারও ছিল যথেষ্ট,—গভীর তাদের শিকড়। উত্তরাধিকারসূত্রে তারা প্রাপ্ত, শিশুকাল থেকে রক্তে তাদের অধিষ্ঠান। আমার পিতৃদেবের রক্ষণশীল মনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষ বৃটেনের কায়েমি অধিকার। এই সংস্কার আমারও অবচেতন মনের কতো গভীরে বাসা বেঁধে ছিল তা আপাত কল্পনার বাইরে। এক এক সময়ে নিতান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করতাম,—এই সংস্কারের শিরা-প্রশিরা মনের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নিচু থেকে কতো নিচুতে নেমে আছে, -সেখান থেকে তাদের নির্মূল করে উচ্ছেদ করা কতো শক্ত।

সংস্কার থেকে মুক্তির প্রয়াসে কার্পণ্য ছিল না আমার। এই প্রয়াসে আমার সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিলেন সুশীল। আমার মধ্যেকার জাতিগত দম্ভ বা সাম্রাজ্যবাদী অহমিকার বহিঃপ্রকাশ যখনই তাঁর নজরে পড়েছে, তখনই সেই কলংক থেকে আমাব মনকে মুক্ত করতে তিনি চেষ্টা করেছেন। তাঁরই সাহায্যে ধীরে ধীরে আমি অনেক মালিন্য পরিহার করতে পেরেছি। তিনি আমাকে যতো ভালো করে চিনেছিলেন, ততো বেশি করে ভালোবেসেছিলেন। আমার কথাবার্তায় বা আচরণে জাতি-ধর্মের অহংকারের প্রকাশ দেখে কখনো

তিনি অসহিষ্ণু হননি। ইংরেজদের সঙ্গে সংস্পর্শ তাঁর বহুদিনের, ইংরেজ চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। রাজনীতি বা ধর্ম, যে ক্ষেত্রেই হোক, আক্রমণাত্মক ব্যবহারের নিঃশংক অথচ উদার প্রতিরোধের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

জোরের সঙ্গে সুশীল আমাকে বলতেন,—'চার্লি, মাঝে মাঝে সেণ্ট পলের পত্রাবলী পড়তে আমার কষ্ট হয়। ইনি যেন তোমাদের এই ইংরেজদের মতোই একজন, সর্বদা চেষ্টা করছেন অপরের বুকে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে। একজন লোককে স্বধর্মের আওতায় আনবার জন্যে দেশ অতিক্রম করছেন, সমুদ্র পার হচ্ছেন। এমন পরমত-অসহিষ্ণুতা, নিজের ধর্মবিশ্বাসকে খাড়া করবার জন্যে এমনি জবরদস্তি স্বয়ং খৃষ্টের মধ্যে কিন্তু নেই। সংগোপনে আপন আবেগে বীজ থেকে জীবন স্ফুরিত হবে, এই হোলো খৃষ্টের শিক্ষা। এই আয়াসহীন স্বাভাবিক বিকাশকে তোমরা বোঝো না,—পূর্ব দেশই বোঝে এই বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তি।'

সেণ্ট পলের ধর্মপ্রচারের এমনি সমালোচনা হয়তো পূর্ণাঙ্গ নয়। যীশুখৃষ্টের পর সেণ্ট পলই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ বন্দনাগান করেছেন। তাঁর বাণী শুধু মুখের কথা নয়,—আপন জীবনের অভিজ্ঞতা ও নিরবচ্ছিন্ন সেবাব্রত থেকেই সে বাণী নিঃসৃত। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে যতোই আমি খৃষ্টচরিত্রকে হৃদয়ংগম করেছি ততোই আমি দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছি যে কী ধর্মে কী রাষ্ট্রব্যবস্থায় পশ্চিম পূর্বের সঙ্গে যে ব্যবহার করে চলেছে তা অসমর্থনীয়। পশ্চিমের জাতীয় আভিজাত্য আর সাম্রাজ্যের অহংকার খৃষ্টচরিত্রের প্রেম ও মমত্ববোধের সম্পূর্ণ বিপরীত। খৃষ্ট বলেছেন,—'শৃগালদেরও মাটির নিচে গর্ত আছে, পাখিরও বাসা আছে বৃক্ষচূড়ায়, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।'

এমনি হঠাৎ হঠাৎ চমক-জাগানো আঘাত-লাগানো কথা সুশীলও বলতেন। তাঁর সেই সব কথার আঘাতে আমার নিরুপদ্রব মনের আত্মতৃপ্তির অর্গল ভেঙে যেত, অপসৃত হোতো অহমিকার আড়াল। খৃষ্টের মুখোমুখি তিনি দাঁড় করাতেন আমাকে।

মত আমার যতোই উদারনৈতিক থাক, ইংলিশ চার্চের গণ্ডীর মধ্যে আমি ছিলাম। আর এই গণ্ডী ছিল সুশীলের কাছে অসহ্য। প্রতি রবিবার প্রভাতে আমরা একযোগে উপাসনা করতাম, প্রার্থনা করতাম প্রভুর আশীর্বাদ। কোনো বিশেষ ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী, তারাই কেবল প্রভুর আশীর্বাদের অধিকারী,—এ কথা সুশীলের মনঃপূত ছিল না। ধর্মান্তরিত হতে হবে, গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে, তবেই কেবল ঈশ্বরের সন্তানরূপে প্রভু খৃষ্ট তোমাকে গ্রহণ করবেন,—নইলে তুমি অপাঙ্‌ক্তেয়, তুমি আশ্রয়হারা,—একথা কি খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে কোথাও লেখা আছে? এই ছিল সুশীলের বিক্ষুব্ধ অন্তরের প্রশ্ন। প্রভু নিজেই কি বলেননি সে এমনি সংকীর্ণ ধর্ম ধর্ম নয়? সর্বমানবের প্রতি প্রভুর অপরিসীম অনন্ত করুণা! সেই করুণাকে খণ্ডিত করব আমরা? কোন্ সাহসে, কোন অধিকারে? খৃষ্ট নিজে বলেছেন, 'শিষ্য যদি তার প্রভুর মতো হয় তাহলেই যথেষ্ট।' প্রভুর গরিমাকে খণ্ডন করবে শিষ্য কোন্ ক্ষমতায়? সুশীল ক্ষুব্ধ মনে বারে বারে এই কথা বলতেন।

ইংলণ্ডের হাইচার্চের ধ্যানধারণা ও নিয়ম-নিষেধ ভারতবর্ষের মাটিতে বপন করা ও পালন করা যে অসম্ভব, শীঘ্রই আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। পরীক্ষার সম্মুখীন হতে বিলম্ব হোলো না। ইংরেজ মিশনারী এবং ভারতীয় খৃষ্টানদের এক ধর্ম-সম্মেলনে প্রস্তাব হোলো যে সকলে একসঙ্গে মিলে এক প্রার্থনা-সভায় যোগ দেবেন, সমবেত ভাবে একযোগে উপাসনা করবেন,—আশীর্বচন শ্রবণ করবেন বৃদ্ধ প্রেসবিটে-

ব্রিয়ান সাধু রেভারেণ্ড ডাক্তার চ্যাটার্জির মুখ থেকে। এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা এলো আমার মনে। পরক্ষণেই বুঝলাম যে অসার অ্যাংলিকান কৌলীন্যের গর্ব নিয়ে পৃথক থাকতে আমি পারব না,—ভারতীয় খৃষ্টানদের সঙ্গে এই অপূর্ব প্রেমযজ্ঞে আমাকে যোগ দিতেই হবে। সুশীল আর আমি একসঙ্গে গেলাম। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা কিছুই না, কিন্তু আমার জীবনে এ এক পরম শুভ সৌভাগ্য। সংস্কারের নিগূড় বন্ধনের একটি গ্রন্থি ঘুচল। যদি না ঘুচত, খৃষ্টের সর্বমানবিক অনন্ত প্রেমধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার জীবন বিফল বিশুষ্ক হয়ে থাকত।

মানুষের নাটমন্দিরে পৌঁছবার পথে নানা দ্বার নানা অর্গল। এবার থেকে একের পর এক অর্গল ভাঙতে লাগল, নব নব অভিজ্ঞতার পরিচয় পেতে লাগলাম আমার যাত্রাপথে।

একবার এক গ্রীষ্মকালে ম্যালেরিয়ার উপর্যুপরি আক্রমণে আমার দেহ অত্যন্ত দুর্বল, সবচেয়ে কষ্ট অনিদ্রা,—এমন সময় সি বি ইয়ং নামে দিল্লীর একজন তরুণ ব্যাপটিস্ট মিশনারী আমাকে শহরের বাইরে এক মিশনে নিয়ে গেলেন। সৎ সামারিটানের মতো আমার সেবা শুশ্রূষা করে তিনি আমাকে নীরোগ করে তুললেন। আমার শুশ্রূষা করতে করতে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে আমি তাঁর মিশন-গির্জায় তাঁর হয়ে উপাসনা-সভা পরিচালনা করে আসব, কেন না তা নইলে তাঁর গির্জায় উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু লাহোরের বিশপ আমাকে সাবধান করে দিলেন যে এ করলে তাঁর এলাকায় আমার ধর্মযাজনার অধিকার বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এ ঘটনা ঘটেছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। আজকালকার দিনে এমন অনুশাসন অন্তত পাঞ্জাবে অসম্ভব। কিন্তু সেদিন এমনি সমস্যা এক আশু সিদ্ধান্তের সংকটরূপে আমার সামনে উপস্থিত হোলো। আমি বিশপকে জানালাম যে তাঁর প্রতি আমার ধর্মগোষ্ঠীগত আনুগত্য নিরংকুশ, কিন্তু এ ব্যাপার আমার আনুগত্যের নয়,—বিশ্বাস ও ভক্তির। অতএব এ ক্ষেত্রে আমি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করব,—কোনো মানুষের

নয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে গ্রন্থির পর গ্রন্থি মোচিত হয়েছে, ভাগ্য আমাকে উন্মুক্ততর কর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

তাছাড়া ইংলণ্ডে যে সব সমস্যার প্রায় সমাধান হয়ে গিয়েছিল,—এখানে সেই সব সমস্যা ফুটে উঠতে লাগল। ইংলণ্ডে বসে বিশপ ওয়েস্টকট আর ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপের পক্ষে 'উনচল্লিশ অনুশাসনে' সই করা এক কথা, আর ভারতে শিশু গির্জার মাথায় সেই শাসনাবলীকে চাপিয়ে দেওয়া অন্য কথা। ইংলণ্ডে থাকতে যেদিন আজকের পদে আমি বৃত হই সেদিনও এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে আমার বিবেকের বাধা আমি অনুভব করছিলাম। সেই বাধা এখন মনের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য ব্যাকুলতার রূপ নিল। মনে হতে লাগল,--সেই প্রথম দিন কেন এই অনুশাসনকে স্বীকার করেছিলাম? অন্যায় করেছিলাম,—কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছিলাম সেদিন।

দিল্লীর এক ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ মিশন-সভায় লাহোরের বিশপ ও কলকাতার মেট্রোপলিটান বিশপের উপস্থিতিতে সুশীল এই অনুশাসনের প্রতিবাদ করে এক প্রবন্ধ পড়লেন। তিনি অকপটে বললেন যে এই অনুশাসনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে পারেননি, সেইজন্যেই তিনি ধর্মযাজক হতে অস্বীকার করেছিলেন। আমার মত চাওয়া হোলো, আমিও সুশীলের মতেই সায় দিলাম। প্রবীণ শিষ্যগণের নির্দেশ থেকে উদ্ধৃত করে বললাম,—যে শৃংখল আমরা বহন করতে পারি নি, আমাদের পূর্বপুরুষরা বহন করতে পারেন নি,—সেই শৃংখল অন্য ভক্তদের গলায় চড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

বিদ্রোহের আভাস দেখে উভয় বিশপ বিচলিত হলেন। এদিকে আমার অন্তরে জমতে লাগল গভীর সংশয়ভাব। মনে হতে লাগল—এই ভারতবর্ষে আমার পথ বন্ধন-মুক্তির পথ। সময় ঘনিয়ে আসছে,

অনতিবিলম্বে আমাকে দৃঢ়নিশ্চয় হতে হবে,—কার আমি সেবক? মানুষের, না ঈশ্বরের?

ক্রিসমাসের এক প্রভাতে চূড়ান্ত মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। প্রভাতী প্রার্থনা-সভায় আমরা উপস্থিত। আমার সমস্ত অন্তর তখন প্রেমানন্দে উদ্বেলিত,—খৃষ্ট আমার, প্রভু আমার, তোমাকে যে বিশ্বাস করি সে তোমারই আশীর্বাদ, তোমাকে যে ভক্তি করি সে তোমারই করুণা। পৃথিবীতে শান্তি,—মানুষে মানুষে সম্প্রীতি—এ তোমারই আদর্শ। এই আদর্শের বন্দনা-গান ধ্বনিত হোক দিগ্‌দিগন্তরে, এই সঙ্গীত-অমৃতে প্লাবিত হোক লোক-হৃদয়।

আমি আর সুশীল পাশাপাশি ধ্যানোপাসনা করলাম।

তারপর প্রভাতী প্রার্থনা আরম্ভ হোলো। অধিকাংশই ভারতীয় খৃষ্টান। শাদা পোষাক-পরা শিশুর দল এক কোণে। তারা বন্দনাগীতি গাইবে। আমি তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে। গান আরম্ভ হোলো। নিষ্পাপ সরল শিশুদের কোমল কণ্ঠের গান। কিন্তু এ কী গাইছে তারা? গানের মধ্যে গর্জন উঠছে, অভিশাপ ফুটছে,—ওরে অবিশ্বাসী, ওরে বিধর্মী, ধ্বংস হবি তোরা, শিগ্‌গির নামবে তোদের অনন্ত সর্বনাশ। ঐ সংগীত-মন্ত্রের কী যে ভয়ংকর অর্থ তা শিশুরা বোঝে না, আর তাদের সরল অজ্ঞতার সঙ্গে সভাস্থ বয়স্ক ভক্তেরা অগ্রাহ্যভরে যোগ দিয়েছে, যান্ত্রিক ভাবে কণ্ঠ মিলিয়েছে ঐ গানে। এখানে ওখানে দু-একজন ভক্ত হয়তো আছেন,—হয়তো সুশীলেরই মতো কেউ,—নিরুদ্ধ তাঁদের কণ্ঠ। তাঁদের বিবেক আপ্লুত হয়েছে, তাঁরা মৌন বেদনায় স্মরণ করছেন খৃষ্টের আপন মুখনিঃসৃত চিরসত্য বাণী,—'বিশ্বাসী শিশুদের বিবেককে যে কলুষিত করে, সে যেই হোক, পাথর বাঁধা হোক তার গলায়, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক তাকে।'

প্রার্থনা শেষ হোলো। আকাশে সূর্য,—অন্ধকার নেমে এল আমার মনে। সুশীল অনুপস্থিত ছিলেন, বাড়ি পৌঁছতে তিনি বললেন—আর কতোদিন এই বীভৎস দাসত্বের গ্লানি আমরা বহন করব? আমার ছেলেকে আমি কি বলেছি জানো? একটি কাজ কখনো যেন সে না করে, জীবনে যেন সে মিশনারী না হয়!

সুশীলের কণ্ঠে ক্লিষ্ট আত্মধিক্কার।

আজ আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আর নিজেকে প্রশ্ন করি,—যখন আমার বুকের নিভৃত মণিকোঠায় ঈশ্বরের সর্বসংশয়বিহীন বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, সর্ববন্ধনমোচনের আহ্বানে রোমাঞ্চিত হয়েছিল আমার হৃদয়, তখন কেন ছিলাম স্তব্ধ হয়ে? কেন ঘোষণা করিনি সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার চরম বিদ্রোহ দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায়? নিজের মনেই আবার আমার প্রশ্নের উত্তর পাই,—হয়তো তখনো সময় আসেনি, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস জাগেনি। তখনো ভেবেছিলাম,—বাইরে যেতে হবে না, ভিতর থেকে যুদ্ধ করলেই চলবে। এই যুদ্ধে সুশীলের নির্দেশ ও সহানুভূতি ছিল আমার শ্রেষ্ঠ সহায়।

ইতিমধ্যে বৃহত্তর অন্যায় ও গভীরতর পাপের সম্বন্ধে আমি অবহিত হয়েছিলাম। জাতিবিভেদ বর্ণবিদ্বেষ এই পাপ। খৃষ্টধর্মের বিশ্বপ্লাবী পবিত্র শান্তিধারা এই পাপ-বিষে পৃথিবীর সর্বত্র কলুষিত। এই অন্যায়ের ফলে সারা বিশ্বে খৃষ্টবিশ্বাসী মানবসমাজের ঐক্য খান খান হয়ে ভেঙে গেছে। এই পাপের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ হয়েও অকুতোভয়ে অবিশ্রাম যুদ্ধ করতে হবে,—নইলে অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ। ছোট খাটো লড়াই যতো গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, মানবতার এই বৃহত্তর সংগ্রামের কাছে সে সব তুচ্ছ।

শিমলা পাহাড়

গত পরিচ্ছেদে আমি যদি পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে থাকি যে, দিল্লীতে যে কয় বৎসর আমি ছিলাম তখন শুধু ধর্মগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমানে বিদ্রোহ করেই আমার দিন কেটেছে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত আমার বিশপের সঙ্গে আমার প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে, তাহলে তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিভেদ ঘটলেও বিশপ আমাকে গভীর ও অকপট স্নেহ করতেন। কোনো কারণেই সেই স্নেহ খর্ব হয়নি। আমি জানতাম যে আমার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত তাঁর অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আমার এ-ও বিশ্বাস ছিল যে অন্যান্য নানা ব্যাপারে আমি তাঁকে যথোপযুক্ত সাহায্য করতে ও প্রচুর আনন্দ দিতে পেরেছি। তাঁর ও আমার উভয়েরই প্রভু যে খৃষ্ট,—সেই পরম প্রভুকে আমি কতো ভালোবাসতাম তা তিনি জানতেন। এই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ আশ্বাস।

লাহোরে তাঁর বাড়ির নাম ছিল বিশপবোর্ণ। যখনই লাহোরে গিয়েছি, তাঁর গৃহকে আমার আপন গৃহ মনে করেছি আমি। আমার আতিথ্য বিশপের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, প্রাণখোলা সমাদর আমার প্রতি ছিল তাঁর। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আনন্দোজ্জ্বল আহ্বান ও উদার আলিঙ্গন প্রতিবার প্রমাণ করত আমাকে দেখলে ও কাছে পেলে সত্যিই তাঁর কতো ভালো লাগে।

দিল্লীতে আসবার অনেক দিন আগে থেকেই আদর্শ খৃষ্টান মিশনারী-রূপে এই বিশপ লিফ্রয়কে আমি অন্তরে বরণ করে নিয়েছিলাম। তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। তাঁর মতো সাহসী অথচ নম্র ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। প্রাণবন্ত ঔদার্য ও অকুতোভয় বলিষ্ঠতার এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় ছিল তাঁর চরিত্রে। চরিত্রগুণে তাঁর সঙ্গে আর

একটিমাত্র পুরুষের আমি তুলনা করতে পারি,—ইনি হচ্ছেন বিশপ মণ্টগোমারি। ইনিও আইরিশ, জীবনের শেষ কয় বৎসর ইনি এখন নিভৃতে ডোনেগালে অতিবাহিত করছেন। বিশপ লিফ্রয় বহু বৎসর ধরে নীরব সহিষ্ণুতায় দেহযন্ত্রণা ভোগ করার পর শান্তির ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন।

নিজের জীবনকে বিশপ লিফ্রয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন। ভয় কাকে বলে তা তিনি জানতেন না, কোনো ব্যক্তিগত বিপদকে তিনি কখনো গ্রাহ্য করেন নি। খৃষ্টরাজত্বপ্রসারের কর্তব্য-অভিযানে যে কোনো অজ্ঞাত বন্ধুর পথে আগুয়ান হতে কদাচ মুহূর্তের দ্বিধা ছিল না তাঁর। খৃষ্টের নামে খৃষ্টান সেবার নব অনুপ্রেরণায় যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় যতো আনন্দ পেতেন এতো আনন্দ আর কিছুতেই পেতেন না তিনি। ধর্মের জন্য আত্ম-নিবেদনের নূতন উদ্যম ও অভীপ্সা নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হলে সাহায্য ও উৎসাহদানে তাঁর কার্পণ্য ছিল না।

দিল্লীতে প্রথম কয়েক বৎসর আমি অত্যন্ত খুশিমনে নিজেকে কলেজের কাজে ব্যাপৃত রেখেছিলাম,—সুশীলের আনুকূল্যে স্থানীয় বন্ধু-সৌভাগ্যও লাভ করেছিলাম যথেষ্ট। তার পর ধীরে ধীরে আমার মনে এক অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা নূতন করে জেগে উঠল। দীনজন সহবাসের আকাঙ্ক্ষা। কলেজের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেও এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় সন্ধান করতে লাগলাম ও সুশীলকে আমার মনোবাঞ্ছার কথা বললাম।

পুরানো দিল্লীতে শবজীমণ্ডী নামে একটি এলাকা আছে, আমাদের কলেজ থেকে সাইকেলে সহজেই সেখানে যাওয়া যেত। এই এলাকায় সমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য চামারদের বাস। এই চামারদের মধ্যে কয়েকজন খৃষ্টান হয়েছিল। আমরা তাদের জন্য ছোট একটি গির্জা

বানিয়ে দিয়েছিলাম, এই গির্জায় ধর্মযাজকরূপে আমি মাঝে মাঝে গিয়েছি। ঐ চামারদের সঙ্গে বাস করবার বড়ো বাসনা হোলো আমার। কাছেই ওদের এলাকা, কলেজের কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

সুশীল আমার পরিকল্পনায় সায় দিলেন কিন্তু আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শংকা প্রকাশ করলেন। আমি মিশন-কর্তা অ্যাল্‌নাটের কাছে আমার ইচ্ছাটি ব্যক্ত করলাম ও তাঁর নির্দেশ মতো লাহোরে গিয়ে বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিশপ আমার অভিপ্রায় শুনে কী যে আনন্দলাভ করলেন তা আমার এখনো মনে আছে। আমার এই নবতীর্থবাসের প্রস্তাবে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন।

দুঃখের কথা আমার এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। দিল্লীর কালব্যাধি ম্যালেরিয়া হোলো চরম প্রতিবন্ধক। এই ব্যাধির উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে এক সময় ভয় হোলো যে ভারতবর্ষে আর আমার থাকা চলবে না, চিরদিনের মতো ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে।

বৎসরের পর বৎসর রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করি, আর প্রতিবার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে পাহাড়ে কাটাতে বাধ্য হই। এই দুরবস্থা অবশ্য আমার জীবনে আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিয়েছিল। কেন না, শিমলার পার্বত্য-প্রবাসে দুজন আশ্চর্য মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমি লাভ করেছিলাম। এক জন স্যামুয়েল স্টোক্‌স, অ্যামেরিকান কোয়েকার,—নিবাস ফিলাডেলফিয়া রাজ্যের জার্মান্‌সটাউন শহর। স্টোক্‌সের সূত্রে পরিচিত হয়েছিলাম সাধু সুন্দর সিং-এর সঙ্গে। সুন্দর সিং-এর বয়স তখন অল্প, পাঞ্জাবের বাইরে নিতান্ত স্বল্প-পরিচিত।

দীনজন সঙ্গে বসবাসের আকুলতা আমার মতো এই দু-জনের মনেও ছিল। তবে আমি যা পারিনি, তাঁরা তা পেরেছিলেন,—সফল হয়েছিল তাঁদের অভীপ্সা। প্রাচীন যুগে সাধু ফ্রান্সিস খৃষ্টের পদানুসরণ করেছিলেন প্রভুর নামে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করে,—একটির

বেশী তুটি পোষাক সঙ্গে না রেখে,—নিঃস্ব হয়ে। সেই নিঃসম্বল চরম আত্মনিবেদনের পথের পথিক হয়েছিলেন আমার এই বন্ধুদ্বয়ও। খৃষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দীতে যখন ভক্তিমানের অকলংক অন্তর বিশ্বাসে অনুরাগে পরিপ্লুত ছিল, তখনকার দিনের আত্মত্যাগের আনন্দ-উজ্জ্বল আদর্শের কাহিনী আজকাল আমরা বইএ শুধু পড়ি। এই তুই মহাপুরুষ তাঁদের আপন জীবনযাত্রার আলোকে পাঞ্জাবের আত্মবিস্মৃত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রাচীন আদর্শকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তখন আমার দেহমন তুর্বল,—সেই অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও একত্র জীবনযাত্রা আমার পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল।

স্টোক্‌স এবং সুন্দর সিং-এর সঙ্গে প্রধানত শিমলার পার্বত্য অঞ্চলেই আমার দেখাশোনা হোতো। মাঝে মাঝে তাঁরা সমভূমিতে নেমে আসতেন, নগ্নপদে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করতেন। যখনই দিল্লীতে আসতেন সুশীলের বাঁধা আমন্ত্রণ ছিল তাঁদের জন্যে। উভয়ের কেউ না কেউ একবার উপস্থিত হওয়ামাত্র সারা বাড়িতে যেন আনন্দোৎসব শুরু হয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠত, আমি ভাবতাম, —যীশুর নাম নিয়ে তাঁদের মতো সহজ সরল জীবন বরণ করে আমি কেন গ্রামের আর পর্বতের পথে পা বাড়াতে পারিনে?

পর পর কয়েক বৎসর ধরে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল, সুশীলের তুই পুত্র আর আমি শিমলা থেকে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে পদব্রজে বার হয়ে পড়তাম। দিল্লীতে তখন প্রচণ্ড গরম। তিব্বত রোডের এক বাঁকে বারেরি বলে একটি জায়গায় আমাদের প্রিয় বন্ধু মিসেস বেট্‌স-এর বাড়ি। সে গৃহে আমরা সাদর আতিথ্য লাভ করতাম। মিসেস বেট্‌স বিধবা। তাঁর স্বামীর চা-বাগান ছিল। এখন সে বাগান নিষ্ফলা, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে চাননি।

রাস্তা থেকে পাঁচ হাজার ফুটের অধিক নিচে পর্বতশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। দূরে মাথার উপরে হিমালয়ের সুবিশাল তুষারশৃঙ্গরাজি। রাস্তার এই বাঁকের পর হিন্দু বসবাসের শেষ। এখন থেকে পথের দু-ধারে ধর্মচক্রশোভিত নানা বৌদ্ধমন্দির। তিব্বত বেশি দূরে নয়।

বারেরি পর্যন্ত পৌঁছবার অনেক আগেই হিন্দুস্থান-তিব্বত রোডের ধারে নরখণ্ডা থেকে হিমালয়ের তুষাররাজি সুন্দর দেখা যায়, যদি অবশ্য উজ্জ্বল দিন থাকে। সমতল থেকে ছাব্বিশ হাজার ফুট উঁচু সেই শৈলপ্রাচীর অর্ধবৃত্তাকারে দিকচক্রবাল ঘিরে রয়েছে। নরখণ্ডা থেকে 'হাটু' পর্বতচূড়ায় ওঠা খুবই সহজ,—সেখান থেকে আরো অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। চূড়ার পর চূড়া,—গভীর নিম্নভূমি পর্যন্ত সমস্ত পর্বতগাত্র জুড়ে বিরাট বিরাট গাছের জটলা,—ঘন অন্ধকার আদিম অরণ্য।

একদিন প্রত্যুষে আমি আর আমার বিশপ নরখণ্ডা থেকে হাটু পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করলাম,—উদ্দেশ্য পর্বতশিখর থেকে তুষার-সৌন্দর্য দর্শন করব। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে চূড়ায় গিয়ে পৌঁছনো মাত্র চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল,—মেঘের অন্তরালে হারিয়ে গেল সামনের দৃশ্যপট। পায়ের নিচের মাটিটুকু কেবল দেখা যায়, সেখানে নানা ফুলে ছাওয়া একটি কার্পেট যেন বিছানো। সারা পর্বতচূড়া জুড়েই এমনি মনোহর পুষ্পগালিচা। দূর শৈলশ্রেণীর রূপ থেকে দৃষ্টি বঞ্চিত হলেও নিতান্ত চোখের কাছে ঈশ্বরের এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখে আমরা ধন্য হলাম।

পর্বতচূড়ায় গায়ে একটি চাতালের উপর আমরা বসলাম। বিশপ তাঁর প্রার্থনা-গ্রন্থটি বার করে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। আমি যোগ দিলাম।

আস্তে আস্তে আমরা পড়তে লাগলাম,—

'হে ঈশ্বর, আমরা তোমার বন্দনা করি।
তোমাকে হৃদয়াসনে বরণ করি জীবন-প্রভুরূপে।
হে পরমপিতা চিরন্তন,—
সমগ্র বিশ্বের পূজা-উপচার তুমি গ্রহণ করো।
হে যীশু, হে খৃষ্ট, তুমি গৌরবের রাজাধিরাজ—'

এই ক-টি কথা যে মুহূর্তে আমরা উচ্চারণ করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘাবরণ ভেদ করে পূর্ব গগনে সূর্য প্রকাশিত হোলো,—আলোকের গৌরবচ্ছটায় উদ্ভাসিত হোলো দিগন্তর। অপসৃত কুয়াশার অন্তরাল ভেদ করে সম্মুখে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হোলো,—দেখলাম হিমাদ্রির অনন্ত তুষার, শ্বেত-ধবল শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ রবিকিরণের স্বর্ণমুকুট পরে নিঃসীম স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে মাথা তুলেছে। আমাদের চারিধার ও নিম্নের সমস্ত দৃশ্য তখনো কুয়াশায় ঢাকা। তাই উপরের ঐ তুষারশৃঙ্গরেখা যেন আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি বলে মনে হোলো,—ওদের ঐ আকাশচুম্বী ললাট যেন এক অনির্বচনীয় মাধুর্য-গাম্ভীর্যে ঠিক মর্মের মাঝখানে উদ্‌ঘাটিত হোলো। প্রকৃতির এই আশ্চর্য গরিমার সহসা প্রকাশে আমরা দুজনেই মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম, তারপর আনন্দের নবীন আবেগে আবার উচ্চারণ করলাম—

'হে খৃষ্ট, গৌরবের রাজাধিরাজ তুমি,—পরমপিতার অমৃতপুত্র তুমি!'

এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সুস্পষ্ট রূপ বহুদিন পর্যন্ত আমার মানস-পটে জাগ্রত ছিল। সেদিন সেই পর্বতশিখরে প্রভাত-সূর্যের আশ্চর্য গৌরবের মধ্যে আমি সত্যই যেন অমৃতপুত্র খৃষ্টের জ্যোতিবিভাসিত মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

একবার বৎসরের শেষের দিকে স্যামুয়েল স্টোক্‌স ও সুন্দর সিং নিকটবর্তী পর্বতমালা অতিক্রম করে ওপারে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে প্রচণ্ড শীতে সুন্দর সিং অশক্ত হয়ে পড়েন। স্টোক্‌স তাঁকে

কাঁধে করে নিয়ে যেতে থাকেন। তিনিও শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েন। সেই নিঃসঙ্গ শীতরাজ্যে দুজনেই অজ্ঞান হয়ে যান। চেতনা-লুপ্তির পূর্বমুহূর্তে উভয়েরই মনে হয় জীবনের শেষ মুহূর্ত বুঝি উপনীত। দেহের শেষ শক্তিবিন্দু যখন অন্তর্হিতপ্রায়, সেই মুহূর্তে এক অবর্ণনীয় আনন্দে সহসা স্টোক্‌সের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়,—তিনি দেখেন, প্রভু তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। স্টোক্‌সের নিজের মুখ থেকেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা আমি শুনেছি।

শেষ পর্যন্ত তুহিন-মৃত্যুর কবল থেকে তাঁরা রক্ষা পান। একদল পাহাড়ী অশ্বারোহী যাত্রী তাঁদের মূর্ছিত ভূ-লুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পায় ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়।

আরও একবার স্টোক্‌সের জীবন সাংঘাতিক বিপন্ন হয়েছিল। তখন সুশীল আর আমি তাঁদের সঙ্গে শিমলা পাহাড়ে আছি। একটি পাহাড়ী ছেলে স্টোক্‌সের সঙ্গে অনেকদিন ছিল,—খৃষ্টান হবার সাধ তার। স্টোক্‌স ছেলেটিকে দীক্ষিত করলেন। এতে স্থানীয় পাহাড়ীরা তাঁর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হোলো। গোপনে গোপনে তারা চক্রান্ত করল, সমভূমি থেকে পাহাড়ী রাস্তায় তিনি যখন ফিরবেন তখন তাঁকে আক্রমণ করবে।

এই ষড়যন্ত্রের কথা আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। একদিন বারেরি-র বাড়িতে বসে সুশীল আর আমি নীরবে পড়াশুনা করছি এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল উঠল। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বার হলাম। দেখি সুশীলের ছেলে সুধীর ও দীননাথ বলে আর একজন ভারতীয় খৃষ্টান যুবক আমাদের আগেই পথে পৌঁছেছে ও ক্রুদ্ধ পাহাড়ীদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের,—মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন স্টোক্‌স,—কপালের উপর গভীর এক রক্তঝরা ক্ষত, সারা দেহ মৃত্যুপাণ্ডুর।

পুরো এক দিন এক রাত স্টোক্‌স অচৈতন্য হয়ে রইলেন, আমরা একে একে তাঁর বিছানার পাশে বসে তাঁর সেবা করতে লাগলাম। অজ্ঞান অবস্থায় সমানে অস্ফুট বেদনা-কাতর শব্দ তাঁর মুখ থেকে বার হতে লাগল। তারপর যখন কথা ফুটল,—বারে বারে ভাঙা হিন্দীতে তিনি বলতে লাগলেন, তাঁকে যারা মেরেছে তাদের কোনো শাস্তি যেন না হয়।

একটু সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন শিমলা যাবেন। কোনো আপত্তি শুনলেন না আমাদের। শিমলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে তাঁকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হোলো। যারা তাঁকে হত্যা করতে গিয়েছিল, তাদের হয়ে তিনি ডেপুটি কমিশনারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যারা ধরা পড়েছিল, তাদের সকলের মুক্তি তিনি আদায় করলেন।

একসঙ্গে আমরা ছিলাম হিমালয়ের ক্রোড়ে,—এক চিন্তা আর এক আদর্শ, আর খৃষ্টের প্রতি একই একনিষ্ঠ অনুরাগের আনন্দ নিয়ে,—নানা বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে একসঙ্গে অনুভব করে। মনে পড়ে, একবার পাহাড়ীদের মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব হোলো,—একযোগে আমরা রোগী ও মুমূর্ষুদের সেবায় নিযুক্ত হলাম। দুঃখ পেয়েছি, আনন্দও পেয়েছি,—আনন্দ-বেদনার লীলাপ্রভু যীশুখৃষ্ট নিরন্তর আমাদের অন্তরে বিরাজ করেছেন।

চারিদিকে পর্বতে ঘেরা, মাঝখানে শান্ত জনপদ। এই পরিবেশ সাধু সুন্দব সিং-এর বড়ো প্রিয় ছিল। নিঃসঙ্গতা ছিল তাঁর কাম্য, একাকীত্বের মধ্যে খৃষ্টের ধ্যানে তাঁর অন্তর আবিষ্ট হোতো। বারেরি থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট নিচুতে কোটগড় নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র খৃষ্টান গির্জা ছিল। একজন বৃদ্ধ জার্মান মিশনারী ও তাঁর বয়স্কা স্ত্রী কী শীত কী গ্রীষ্ম এই ধর্মমন্দিরে বাস করতেন। শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট

এই মিশনারীর নাম রেভারেণ্ড বিউটেল। বিউটেল দম্পতির প্রায় সারা জীবনই হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে কেটেছে। এঁরাও ছিলেন আমাদের বন্ধু।

স্টোক্‌সের ছিল একটি শিশু-পরিবার। একটি শিশু অন্ধ, আর একটি খঞ্জ। আর তিনটি ছিল কুষ্ঠরোগীর সন্তান, যদিও তাদের কুষ্ঠ হয়নি। সর্বহারা মানুষের সমাজে প্রত্যেকটির জন্ম। চরমতম দুর্দশা থেকে কুড়িয়ে এনে স্টোক্‌স তাদের প্রতিপালন করেন। এমনি উচ্ছল উল্লাসভরা শিশুর দল আমি আর কোথাও দেখিনি। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালোবাসে,—হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই,—জীবনের সামান্য ভাগ্যকে খুশিমনে একসঙ্গে ভাগ করে নেয়। চমৎকার তাদের সাহচর্য!

সাধু সুন্দব সিং-এর নির্জনতা-প্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ। প্রায়ই তিনি অদৃশ্য হতেন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁর কোনো খোঁজ থাকত না। আবার একদিন নীরবে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে সেবার কাজে হাত মেলাতেন। কোথায় যে তিনি যেতেন কেউ তা জানত না। কোটগড়ের অদূরে অরণ্যের মধ্যে একটি নিভৃত গুহা ছিল। সেই গুহায় তিনি সারাদিন যীশুর উপাসনা ও ধ্যান করতেন।

সাধু সুন্দব সিং-এব মতো মহৎ আত্মা আমি অতি অল্পই দেখেছি। বিরল মানুষ ছিলেন তিনি, বিরল তাঁর মহত্ত্ব। খৃষ্ট তাঁর প্রভু, খৃষ্ট তাঁর অন্তর-দেবতা,—এই দেবতার অতীন্দ্রিয় স্পর্শে বিভোর ছিল তাঁর চৈতন্য। তাঁর জীবনের মূলে ছিল অনন্যপরায়ণ আত্মনিবেদন। হিন্দুস্থান রোড ধরে অগ্রসর হয়ে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে প্রবেশ করবেন, প্রভু যীশুর নাম প্রচার করবেন সেই অজ্ঞাত রাজ্যে,—এই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। ভয়ংকর বিপদ-সংকুল গিরিবর্ত্ম পার হতে হয় সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের মানসে। কষ্টের অবধি নেই, মৃত্যুর বাধা পদে পদে। ১৯০৮ সালে কোটগড় থেকে বহুদিন ধরে নিরুদ্দেশ ছিলেন

সাধু সুন্দর সিং। সেই সময় তিনি এই পথ অতিক্রম করেছিলেন। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালের শেষভাগে আবার তিনি এই পথে যাত্রা করেছিলেন। পদে পদে মরণের হাতছানি,—কতো কষ্ট তিনি সহ্য করেছিলেন, কতো বিপদ জয় করেছিলেন, কেউ তা জানে না।

বারেরিতে অবস্থানকালের একটি মহা উত্তেজনাকর ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন গ্রীষ্মকাল। খবর রটল যে সুদূর তিব্বত থেকে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে একজন ইউরোপীয় পর্যটক আসছেন। কয়েক দিন পরে তিব্বতী পথপ্রদর্শক সমভিব্যাহারে পর্যটক এসে পৌঁছলেন। সেদিন রবিবার,—আমরা বারেরি থেকে কোটগড় গির্জায় সান্ধ্য-প্রার্থনা সভায় গিয়েছি। দেখি,—এক অপরিচিত দাড়িওয়ালা ব্যক্তি গির্জায় এসে উপস্থিত। তিনিই বিখ্যাত বিশ্বপর্যটক সোয়েন হেডিন।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর একটি সুন্দর কাজ সোয়েন হেডিন করলেন। গত দু-বছর ধরে তিনি সমানে পর্যটন করে এসেছেন। এই দু-বছর ধরে সর্বদা তাঁর সঙ্গে একটি সোনার ক্রোনোমিটার যন্ত্র থাকত। বিধাতা তাঁকে আবার নিরাপদে সভ্যসমাজে পৌঁছে দিয়েছেন এই কৃতজ্ঞতায় তিনি সেই মূল্যবান যন্ত্রটি গির্জায় দান করলেন।

দীননাথের ভাই অমরনাথ ছিল আমার ছাত্র। সে তখন অসুস্থ অবস্থায় বারেরিতে আমাদের কাছে ছিল। আমি তার শুশ্রূষা করতাম। বিখ্যাত পর্যটকের আসন্ন আবির্ভাবের খবর শোনামাত্র তার উত্তেজনার সীমা নেই,—কিন্তু রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় সে কেমন করে তাঁকে দেখতে পাবে? আমি সোয়েন হেডিনকে অনুরোধ করলাম তিনি যদি নরখণ্ডা যাত্রার পথে বারেরি হয়ে যান, তাতে রুগ্ন ছেলেটির অভিলাষ পূর্ণ হবে। হেডিন সানন্দে রাজি হলেন। রোগশয্যার পাশে বসে তিনি

অনেকক্ষণ ধরে অমরনাথের সঙ্গে গল্প করলেন,—তাঁর অভিযানের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালেন। রোগীর দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চরিতার্থতার পুলকে। অমরনাথের রোগমুক্তি ঘটেনি,—তার স্বল্পায়ুর প্রতি সোয়েন হেডিনের এই অনুগ্রহ মূল্যহীন দান। বিদায় নেবার সময় সোয়েন হেডিন আমাদের বললেন,—গত দু-বছরের অধিক কালের মধ্যে ইউরোপীয় ভাষায় এই দ্বিতীয় বার তিনি কথা বললেন। এ আগের বার বলেছিলেন গিরিবর্ত্মের মধ্যে একদল ককেশীয় মিশনারীর সঙ্গে। শৈলরাজির মধ্যে অজ্ঞাত জগতের এতো গভীরে তিনি হারিয়ে ছিলেন এতোদিন !

পাহাড়ী পথ বেয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে তিব্বতীরা মাঝে মাঝে এপারে আসত তাদের পশরা নিয়ে। সে সব দ্রব্যের বদলে তারা নিয়ে যেত পাঞ্জাবের তাঁতে বোনা পছন্দসই কম্বল। শতদ্রু নদীর উপত্যকায় রামপুরের বিখ্যাত বাৎসরিক হাটে এইসব কম্বল বিক্রী হোতো। সুন্দর সিং যখন আমাদের সঙ্গে থাকতেন তখন তিনি প্রায়ই এই সব আগন্তুক তিব্বতীদের সঙ্গে আলাপ জমাতেন ও তিব্বতী ভাষা শিখতে চেষ্টা করতেন। সুন্দর সিং দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন যে খৃষ্টের অমোঘ বাণী কণ্ঠে নিয়ে তিনি আবার নিষিদ্ধ তিব্বতে ফিরে যাবেনই, যদি তাতে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হয় তাও স্বীকার। আগের বার তিনি যখন গিয়েছিলেন তখনও মৃত্যুর শৃঙ্খলে তিনি বাঁধা পড়েছিলেন। তখন তাঁর অল্প বয়স দেখে করুণা করে অনিবার্য জীবনাবসানের হাত থেকে কয়েকজন তিব্বতী রমণী তাঁকে বাঁচিয়েছিল।

নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন সাধু সুন্দর সিং। খৃষ্টপ্রেমের বন্ধুরতম পথে একলা চলার ব্রত ছিল তাঁর। এই ব্রতপালনের অহর্নিশ স্বপ্নে ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ আনন্দ। তাঁর কাছে যখনি আমি বসতাম, কোনো কথা প্রায় হোতো না, কিন্তু সেই নীরব সহ-অবস্থিতির মধ্যে আমি

যেন এক অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় ভাবে খৃষ্টের সান্নিধ্য অনুভব করতাম। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেছিলেন,—ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা শোনবার জন্যে দেশে বিদেশে সহস্র সহস্র লোক ভিড় করেছে,—তাঁর বাণীকে অমৃতসম জ্ঞান করেছে। কিন্তু বহুদেশের বহু মানবের শ্রদ্ধা ও স্তুতিতেও তাঁর চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সারল্য ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি,—প্রশংসাবাদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। জনকোলাহলের প্রান্তে তিনি প্রায়ই অপসরণ করতেন নিজেকে,—তখন নিভৃত ধ্যানে তাঁর প্রভুর মুখোমুখি বসতেন তিনি।

গত চার বৎসর পূর্বে সুন্দর সিং-এর সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হয়। সেই সাক্ষাৎ আমার পরম সৌভাগ্য। বিশেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তিনি শিমলা বাজারে ম্যালের নিচে ভাবতীয় গির্জায় এসেছিলেন। রোগজীর্ণ তাঁর মূর্তি তখন,—কতো ক্লান্ত, কতো অশক্ত! কিন্তু আমাদের কথাবার্তায় খৃষ্টপ্রসঙ্গে তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, শ্রান্তরূপ যেন অপসৃত হোলো এক মুহূর্তে। আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

তারপর থেকে বহুবার নানাভাবে সন্ধান করেছি, কিন্তু সাধু সুন্দর সিং সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমি পাই নি। জনশ্রুতি এই যে, তাঁর স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ে, দৃষ্টিশক্তিও দুর্বলতর হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও খৃষ্টের মহিমাপ্রচারের চুম্বক-আবেগে তিনি পুনর্বার তিব্বত দেশের অভ্যন্তরে যাত্রা করেন।

এই সংবাদ সত্য কি না, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তিনি জীবিত আছেন কি না তাও জানা নেই।

প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, এই তিন বৎসরে সাধু সুন্দর সিং-এর কোনো সংবাদ কেউ জানে না। ভারতে যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন

ও তাঁর গভীর স্বাস্থ্যহানির কথা জানতেন তাঁদের ধারণা তিব্বতের পথে তিনি দেহ-রক্ষা করেছেন। হয়তো আজও তিনি জীবিত, কিংবা হয়তো তাঁর পথিক আত্মা মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করে পরম শান্তির পথে যাত্রা করেছে। একটি বিষয়ে কিন্তু কোনো অনিশ্চয়তা নেই। পরম-প্রভু খৃষ্ট তার আবির্ভাবের মহামুহূর্ত থেকে আজও পর্যন্ত মরজগতে মানবসমাজে যে অন্তহীন অকৃপণ কৃপা বিতরণ করে চলেছেন, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সাধু সুন্দর সিং-এর খৃষ্টসম নিবেদিত জীবন। তাঁর জীবনাদর্শের তুলনা এ যুগের সারা খৃষ্টানসমাজে দ্বিতীয় নেই।

'খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘ' নামে স্যামুয়েল স্টোক্‌স এক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি লাহোরের বিশপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের উপদেশ নিয়েছিলেন।

পরম-প্রভু বিশ্বত্রাতা যীশুখৃষ্ট এই মর্তভূমিতে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, ঠিক সেই জীবনকে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এই সংঘের ভ্রাতৃবৃন্দ। খৃষ্টোপম জীবনযাপনের আনন্দে সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প ছিল ভ্রাতৃগণের প্রধান সংকল্প। নিজস্ব বলতে কিছুই কারো থাকবে না। যীশু সব চেয়ে ভালোবাসতেন দরিদ্র্যদের,—দরিদ্রের সেবাই ছিল এই সংঘের প্রধান আকর্ষণ ও কর্তব্য। সাধু ফ্রান্সিসের প্রথম ভক্তগণের মতো এই সংঘের সভ্যরাও দরিদ্রের ভ্রাতা হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন।

এই নূতন ভ্রাতৃসংঘের আরম্ভে স্যামুয়েল স্টোক্‌স আর ব্রাদার ওয়েস্টার্ণ এই দুজন পূর্ণসদস্য হলেন। ওয়েস্টার্ণ ছিলেন কেম্‌ব্রিজ মিশনের একজন তরুণ সভ্য,—স্টোক্‌সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বহুদিন থেকে দারিদ্র্যের ব্রর্ত-বন্ধনে স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িয়েছিলেন। সাধু সুন্দর সিং ও উইলিয়ম ব্রাঞ্চ এই সংঘের সদস্য না হলেও একই রিক্ততার ও সেবার আদর্শে এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

এই ভ্রাতৃসংঘে যোগ দেবার জন্য আমায় সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু উপর্যুপরি ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আমার দেহের তখন এমনই দুরবস্থা যে মনের হতাশাকে মনে চেপে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যীশুখৃষ্টের নামে বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের এই কঠোর পথে যাঁরা পা বাড়ালেন, এই তরুণ বীরদের প্রতি আমার অন্তরের সমস্ত

শুভকামনা ধাবিত হোলো। বিশপ লিফ্রয়ের আন্তরিক উৎসাহ ও আশীর্বাদও তাঁরা লাভ করলেন। এই ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন,—পাঞ্জাবের খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে এমন একটি সংঘের উদ্বোধন তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে তিনি মনে করেছিলেন। লাহোর গির্জার এক বিশেষ উপাসনা-অনুষ্ঠানে তিনি ভ্রাতৃবৃন্দকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করলেন,—খৃষ্টানুসরণের বন্ধুর পথযাত্রায় তাঁদের হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

উত্তর-পাঞ্জাবের পাহাড়ীদের সারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন স্টোক্স, তাদেরই সেবায় তিনি উৎসর্গ করলেন নিজেকে। কিন্তু কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে লোকে তাঁকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না,—তাঁর সেবাব্রতের ভুল অর্থ করছে তারা। তারা ভাবছে নিজের ব্যক্তিগত পারমার্থিক উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য। এই ভুল-বোঝাবুঝি ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল,—সেবাব্রতী স্টোক্স নিত্য অনুভব করতে লাগলেন যে দিনে দিনে নিরর্থক হয়ে উঠছে তাঁর প্রয়াস।

তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের যা ধারণা তা গোপন করত না তাঁর পাহাড়ী বন্ধুরা। তারা বলত,—'তুমি তো বিত্তহীন সংসারবন্ধনহীন সাধু,—তোমার পক্ষে পুণ্যসঞ্চয় আর শক্ত কী? তোমার মুক্তির পথে বাধা কোথায়? কিন্তু আমরা গরীব সংসারী লোক,—প্রলোভন আর পাপ নিয়েই আমাদের ঘর। সংসার প্রতিপালনের জন্যে রুটির জোগাড় করতেই আমাদের দিন যায়,—ধর্মের কথা ভাববার সময় কোথা আমাদের? তোমার মোক্ষ তো হাতের মুঠোয়,—কিন্তু জন্মজন্মান্তর ধরে এই পাপ পৃথিবীর পাকে পাকে আমাদের ঘুরতে হবে।'

দিনে দিনে স্টোক্স উপলব্ধি করতে লাগলেন যে ভারতের গৃহ-সংসারহীন পথচারী সাধারণ সাধুদের এরা যে চোখে দেখে, সেই

চোখে তাঁকেও এরা দেখছে। এই সব সাধুরা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ায়,—নিতান্ত কর্তব্যবিমুখ আলস্যে। যদি বা কেউ জপতপ করে, তা শুধু নিজেরই আত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্টোক্‌সের উদ্দেশ্য তো আলাদা। স্বার্থপর আত্মশোধন তাঁর লক্ষ্য নয়, বৃহৎ সংসারের সেবার মানসেই তিনি সংসার-নিগড়ে বাঁধা পড়েননি। অসামাজিক অকৃতদার তিনি, কিন্তু সমাজকল্যাণেরই জন্য তাঁর খৃষ্টোপম আত্মদান,—এ কথা তিনি অপরকে বুঝাবেন কেমন করে? ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের জন্য তাঁর কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই,—কিন্তু তাঁর নিঃসম্বল সন্ন্যাসী-জীবন দেখে বিপরীত ধারণাই যে করছে লোকে!

স্টোক্‌সের জীবনে এ এক নিদারুণ সমস্যা। দিন রাত্রি এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি,—যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এই সমস্যার সমাধান। এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই তাঁর মনে প্রতিভাত হোলো। উত্তর-ভারতের পার্বত্য অধিবাসীদের সেবায় জীবনোৎসর্গের সংকল্প তাঁর,—তিনি স্থির বুঝলেন এই অধিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে এদেরই মতো সাংসারিক জীবনের দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। এই পাহাড়ীদের মধ্যে বাস করবেন তিনি, এদের সমাজেই বিবাহ করবেন,—তবেই না সুখে দুঃখে এদের একাত্ম হবেন তিনি।

স্টোক্‌স যদি এই পথ গ্রহণ করেন তাহলে 'খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘ' ভেঙে যাবে—এই কথা ভেবে আমার খুব মন খারাপ হোলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মতে সায় দিতে হোলো আমাকে। বিশপ কিন্তু কিছুতেই স্টোক্‌সের যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না। তীব্র আপত্তি জানালেন। স্টোক্‌সের সিদ্ধান্তের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে প্রথম থেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন সুশীল রুদ্র।

শেষ পর্যন্ত স্টোক্‌স শৈলপালিতা এক রাজপুতানী মহিলাকে বিবাহ করলেন। এই মহিলা ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন। বহু বৎসর পূর্বে চা-বাগানের কাজে একজন চীনা খৃষ্টান কোটগড়ে আসেন ও এক রাজপুত

পরিবারে বিবাহ করেন। স্টোক্‌সের স্ত্রী এই চীনা খৃষ্টানের পৌত্রী। ষ্টোক্‌সের সন্তান-সন্ততির ধমনীতে তিনটি বিভিন্ন জাতির রক্তধারার সমন্বয়।

স্টোক্‌সের এই বিবাহের পিছনে আরো একটি প্রেরণা ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত খৃষ্টান। নিজেদের খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে ইউরোপীয়ানরা ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবিদ্বেষমূলক যে দুর্ব্যবহার করত, তা দেখে দেখে পীড়িত হয়েছিল স্টোক্‌সের চিত্ত। স্বাজাত্যবোধের অহমিকা ও বর্ণবিদ্বেষের কালিমা ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়ানদের এমনই এক অদ্ভুত মানসিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল যে এমন কি মৃত্যুর পরেও ভারতীয় ও অভারতীয় খৃষ্টানের মরদেহের সমাধি পাশাপাশি রাখা নিষেধ ছিল বহুক্ষেত্রে। শাদা-কালোর এই বিভেদ সবচেয়ে প্রকট ছিল পাঞ্জাবে, এই বিভেদ মৃত্যুরজ্জুর ফাঁস পরিয়েছিল খৃষ্টান সমাজের কণ্ঠে। বলিষ্ঠতম উপায়ে স্টোক্‌স এই বন্ধনকে ছিন্ন করেছিলেন। মানবাত্মার এই অবমাননার বিরুদ্ধে উদারতম বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভাবতীয় নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে,— ভারতীয় সংসারকে আপন সংসাব বলে গ্রহণ করে। তিনি মনে ভেবেছিলেন, এ যদি তিনি না করেন তাহলে প্রভু যীশুর প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। যীশুখৃষ্টের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির সম্মুখে কে বা আর্য, কে বা বর্বর, কে-ই বা স্বাধীন আর কে-ই বা দাস। তাঁর সমদৃষ্টিতে সকলেই সমান,—সকলেরই অন্তরে তাঁর অধিষ্ঠান।

ভারতীয় নারীকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করার পিছনে স্টোক্‌সের অতি মহান উচ্চাভিলাষ ছিল। খৃষ্টান বিবাহের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিনি, কিন্তু এ কথা স্থির উপলব্ধি করেছিলাম যে তাঁর এই বিবাহ নিতান্ত সহজ বিবাহ নয়,—সমাজ-কল্যাণের এক মহান প্রেরণায় এ তাঁর জীবনব্যাপী আত্মপরীক্ষার ব্রত।

তাই এই ব্রত পালনের পথে তাঁকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাতে আমি দ্বিধা করিনি। ইতিমধ্যে আমি স্থির বুঝেছিলাম যে, এ যুগের মানব-সংস্কৃতির কুৎসিততম শত্রু বর্ণবিভেদ,—যীশুর পবিত্র ক্রুসচিহ্নের অঙ্গে পাপের কালোছায়া এই বর্ণবিদ্বেষ।

স্টোক্‌সের বিবাহের ফলে 'খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘ' ভেঙে গেল। এই সংঘকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। স্টোক্‌সের সংসার-প্রবেশ সংঘের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত, এই আঘাত আপন বুকে অনুভব করলেন আমাদের বিশপ। অন্যান্য অনেকেও গভীর দুঃখ পেলেন এই ঘটনায়। কিন্তু আজ যখন দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন মনে হয় মানুষের আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বুঝি অতি বিচিত্রভাবে আপন উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। ভ্রাতৃসংঘের নিয়ম-শৃংখলার দৃঢ় বন্ধন ঈশ্বর যেন হঠাৎ খসিয়ে দিলেন। এই আশ্চর্য মুক্তির ফলেই সুন্দর সিং-এর মতো সাধু খৃষ্টের প্রতি আত্মনিবেদিত জীবনকে সারা বিশ্বের সেবায় বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কী পাশ্চাত্য কী প্রতীচ্য, বিশ্বের সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন সাধু সুন্দর সিং। খৃষ্টপ্রেমের অকুণ্ঠ বিতরণের বিনিময়ে দেশে বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেম তিনি অর্জন করেছিলেন। সংঘের বন্ধনে যদি তিনি বাঁধা পড়তেন, তা হলে এ হোতো না। কোনো সংঘ বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার মানুষ ছিলেন না সুন্দর সিং। তিনি ছিলেন একলা পথিক,—এক যীশুর পথ-প্রদর্শনকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই পথে তিনি ছিলেন অকুতোভয় নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী।

সংঘের অপর সদস্য ব্রাদার ওয়েস্টার্ণের মুক্তিও মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। বিশিষ্ট কর্মপথে তিনি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, সংঘের মধ্যে থাকলে তা সম্ভব হোতো না। যে কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ পারত না, সেই কাজের ভার ঈশ্বর তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

ঈশ্বরের মহা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল তাঁর জীবনে। ব্রাদার ওয়েস্টার্ণ এখন দক্ষিণ-ভারতে টিনিভেলির বিশপ, বিরাট এক ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের তিনি সেবক। এই সমাজের অধিকাংশ লোকই অতি দরিদ্র। যাদের মঙ্গলাকাংক্ষায় নিত্য-নিয়োজিত তাঁর জীবন, তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপ্রীতি তিনি লাভ করেছেন।

কয়েকটি ক্ষুদ্র কথায় স্যামুয়েল স্টোক্স সাধু সুন্দর সিং ও অন্যান্য বন্ধুগণের জীবন-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আমার সেদিনের অন্তর-জীবনের কাহিনীই আমি উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছি। ভারতে আমার মর্ম-অভিধানের এঁরাই ছিলেন নেতা,—দৈহিক কারণে অবিলম্বে এঁদের তীর্থযাত্রায় যোগদান করতে না পারলেও এঁদের জীবন ও এঁদেরই পন্থায় আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। এঁদেরই কল্যাণে জীবন্ত যীশুর ধ্যানরূপ আমি ভারতভূমিতে উপলব্ধি করেছি, এঁদেরই আদর্শে আনন্দিত আবেগে শেষ পর্যন্ত সেবা ও কল্যাণের সত্য পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

সংসারী জীবনের চেয়ে সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর জীবনকে ভারতীয়েরা বড়ো বলে মনে করে। এই মনে করাটা স্বাভাবিক নয়। ভারতবাসীর এই ধারণার পরিচয় স্টোক্স অনেক আগেই পেয়েছিলেন, আমি অতো শীঘ্র বুঝতে পারিনি। বিবাহিত জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন মহত্তর,—এই ধারণা আমি মিথ্যা এবং হীন বলে মনে করি। স্বামিস্ত্রীর সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনকে হেয় করলে খৃষ্টের বাণীকেই অবজ্ঞা করা হয়। মানবপুত্রের আদিম সৃষ্টির মূলে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক,—এই সম্পর্ক পবিত্র। বিবাহবন্ধন এক অতি পবিত্র ধর্মবন্ধন,— সংসারজীবন এতো পবিত্র যে যীশু বলেছেন যে পৃথিবীর শিশুরা স্বর্গোদ্যানের কুসুম-কোরক।

আমি নিজে বিবাহ করিনি। আমার অকৃতদার জীবনযাত্রা নিয়েও লোকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহ করব কি করব না,—কোন্ পথে প্রভুর নির্দ্দেশ আমি ভালো ভাবে পালন করতে পারব? তখন আমার মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে আমাকেও আশু মতিস্থির করতে হবে। তার পর অবশ্য বহু বৎসর কেটেছে। স্যামুয়েল স্টোক্স যে ভুল ধারণার সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতভূমিতে আমার সুদীর্ঘ নিত্যপর্যটনায় ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমনি ভ্রান্ত ধারণার সম্মুখীন আমাকে কোথাও কখনো হতে হয়নি।

এ সব ঘটনা কুড়ি বৎসর আগেকার কথা। খৃষ্টান-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই কুড়ি বৎসর আমার কেটেছে। শিমলার পার্বত্য-অঞ্চলে স্যামুয়েল স্টোকস্, সুন্দর সিং ও সুশীল রুদ্রের সঙ্গে অতিবাহিত দিনগুলি কুড়ি বৎসরের ব্যবধানের প্রান্ত থেকে স্পষ্টতর রূপে আমার চোখে ফুটে উঠেছে। স্পষ্টতর ভাবে আমি উপলব্ধি করেছি যীশুর পারমার্থিক রাজ্যের এক অপূর্ব বিধান,—সে বিধানের মর্ম তিনি অতি সহজ স্বচ্ছ উপমায় ভক্তের প্রাণে গেঁথে দিয়েছেন। প্রভু বলেছেন,—'যবের শুষ্ক শীর্ষ মাটিতে ঝরে পড়ে, তাই শস্য জন্মায়। যে মুকুল ঝরে না, সে মুকুল একাকী। যে মুকুল ঝরে, সেই আনে ফলের সমারোহ।'

স্টোক্স এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ খৃষ্টানুসরণের যে প্রাথমিক পরীক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, তারই ফলে শ্যামলা ভারতভূমিতে সঞ্জাত হয়েছিল মহার্ঘ ফসল। স্টোক্সের বিবাহের পর খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল,—কিন্তু সে মৃত্যুতে ছিল পুনর্জীবনের আশীর্বাদ। এই ভ্রাতৃসংঘের আদর্শ-বীজ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন রূপের নানা প্রেমাশ্রয়-তরু। দক্ষিণ ভারতের থিরুপতুরে ও যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ায় অবস্থিত খৃষ্ট-আশ্রমগুলি এই নবজীবনের

নিদর্শন। এই মানবসমাজে যারা আশাহত, যারা দুর্গত তাদের সেবায় জীবনোৎসর্গের আহ্বান নিত্যকাল প্রভু খৃষ্টের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। সেই আহ্বানে সাড়া দেবার মতো ভক্তসংখ্যাও বিরল নয়। তার প্রমাণ পুণার খৃষ্ট-সেবাসংঘ ও অনুরূপ নানা প্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারতের কোণে কোণে যারা ছড়িয়ে আছে।

মানবপুত্রের এই আহ্বান কতো ভাবে আমাদের কানে বাজে,—কতো রূপে তিনি আবির্ভূত হন ভক্তের চিত্তমন্দিরে! সেই আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ ভক্তের ইন্দ্রিয়,—সেই আবির্ভাবের আহ্বানে বিনিদ্র ভক্তের হৃদয়। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীর নিবিড় অন্ধকারে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো তাঁর প্রকাশ। তপ্ত দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত পরিব্রজ্যার মধ্যে তাঁর উপস্থিতি,—হয়তো বা শান্ত প্রত্যূষের অরুণিমায় হয়তো বা ম্লান গোধূলির ধূসরতায় তাঁর স্পর্শ। আশামর্মরিত নিত্য-প্রতীক্ষিত অন্তর নিয়ে দৃঢ় মেখলায় বসন সম্বৃত করে প্রিয়-আহ্বানে কান পেতে থাকে অভিসারিকা। পরম-প্রভুর কর্ম-আহ্বানে তেমনি সর্ববন্ধনমুক্ত নিত্য-প্রস্তুত প্রতীক্ষা আমাদের,—আমরা এই খৃষ্টপথের পথিক দল।

অ্যালবার্ট স্কুইটজার

সংশয়-সমস্যার ভার তখনো আমার মাথা থেকে নামে নি। এক দিকে আমি সাধনা করছি কী ভাবে আমার জীবন-যাত্রাকে খৃষ্টের পদচিহ্নের মধ্যে বিলীন করতে পারি, অন্য দিকে তাঁর ইচ্ছার আক্ষরিক নির্দেশকে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে হেঁটমুখে মান্য করতে পারছি না। ঠিক এমনি সংকটক্ষণে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ আমি লাভ করলাম। মহান খৃষ্টান অ্যালবার্ট স্কুইটজারের আত্মিক সম্পর্ক আমি লাভ করলাম। এই সম্পর্ক আমার ভাগ্যে এক অতি মহার্ঘ সম্পদ।

দিল্লীর খৃষ্টীয় সমাজের আওতায় তখন আমার পদে পদে নানা জটিল সমস্যা, নানা দুর্বোধ্য প্রশ্ন, নানা নিরুপায় বিহ্বলতা। বন্ধ ঘরে ঝটিকার আঘাতে যেমন করে রুদ্ধ দ্বারের অর্গল ভাঙে, ঘুচে যায় ধূলি-জঞ্জালের মালিন্য,—ঠিক তেমনি করে সমুদ্রপার থেকে অ্যালবার্ট স্কুইটজারের বিজয়ী স্পর্শের আঘাত আবেষ্টনীর কারাগার থেকে মুক্তি দিল আমার মনকে। প্রথমে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে স্কুইটজারের সঙ্গে আমি পরিচিত হই, পরে তাঁর ব্যক্তিগত নিবিড় বন্ধুত্বের দুর্লভ আনন্দ আমি লাভ করি।

'ঐতিহাসিক যীশুর সন্ধানে' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এমনি হয় যে একটি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে জীবনের সম্যক দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। আমারও ক্ষেত্রে এইরূপই হয়েছিল। এই পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদটি পড়ে আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল স্কুইটজার যেন তাঁর রচনার মাধ্যমে আমার নিভৃত আত্মাকে স্পর্শ করেছেন।

গসপেলের ঐতিহাসিক অংশাবলী আমি তখন অত্যন্ত নিবিষ্ট আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করছিলাম,—আমার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যেই বিশেষ করে খৃষ্ট-জীবনীর এই দিকটি নিয়ে আমাকে বেশি করে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থসমূহও আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করছিলাম। কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি হিন্দু অবতারের সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পকাহিনীর অন্ত নেই। আমার কেবলই মনে হতো আমার ধর্মগ্রন্থেও যীশুখৃষ্টের জীবনীর মধ্যেও কল্পকাহিনী মিশে নেই কি?

তা যদি হয়, তাহলে খৃষ্ট-জীবনীর কতোটা সত্য আর কতোটা কল্পনা, কতোটা পুরাণ আর কতোটা ইতিহাস? যীশুখৃষ্ট কি নিছক পৌরাণিক চরিত্র না তিনি ঐতিহাসিক জননায়ক? অনুসন্ধিৎসু খৃষ্টভক্তের কাছে এ সমস্যার সমাধান কোথায়?

এ শুধু বুদ্ধিবাদীর সমস্যা নয়,—এ আত্মার সংশয়। রক্তে আমার তখন ম্যালেরিয়ার বিষ,—রুগ্ন দুর্বল দেহ, স্তিমিত শক্তি। মানসিক দুর্বলতার পক্ষে প্রশস্ত অবস্থা। সেই সময়ে বারে বারে সংশয়ের প্রেতচ্ছায়া মনকে আক্রমণ করে, আচ্ছন্ন করে সুস্থ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টিকে। কেম্‌ব্রিজে যখন ছিলাম তখনো এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। কিন্তু সেখানে থাকতে অধ্যয়নের যে ব্যাপক সুযোগ ছিল এখানে তা নেই। এখানে গবেষণার উপকরণ নেই,—যা বই হাতের কাছে আসে তাই পড়ি, তার বেশি পড়ার সুযোগ মেলে না। সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই না।

খৃষ্ট-জীবনীর ঐতিহাসিকতা বা পৌরাণিকতা নিয়ে এই যে প্রশ্ন,—এমনি আরো নানা প্রশ্ন নানা অসুবিধা আনে। আমার অন্য কাজের মাঝে মাঝে তারা ভিড় করে,—বিভ্রান্তি আনে সদা সর্বদা। উত্তরহীন এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে গোপন ক্ষতের মতো জমা হয়,—বহির্বাস্তবের সঙ্গে আমার আত্মার যোগসূত্রকে শিথিল করে দেয়। জ্ঞানের যেখানে অভাব, বিশ্বাসেরও সেখানে দৈন্য,—নৈতিক সমস্যা সেখানে প্রবলতর।

সাধু জনের সুসমাচারে একটি অনুচ্ছেদ আছে, যেখানে তাঁর ভক্তবৃন্দকে খৃষ্ট বলছেন,—'অল্পকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, আবার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না।'

আমার খৃষ্ট-নিবেদিত সমগ্র জীবনে প্রভুর এই বাণী এক আশ্চর্য সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো সময়ে তাঁর স্পর্শ আমার অন্তরের এতো নিকটে আমি অনুভব করেছি যে তাঁর উপস্থিতির কোনো বাহ্যিক সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়নি,—উপহাস করতে পেরেছি সমস্ত সংশয়কে। তাঁর প্রথম ভক্তজনের মতোই আমি তখন বলতে পেরেছি,—প্রভু, স্পষ্ট আপনার ব্যক্য, প্রহেলিকাহীন প্রমাদবিহীন। তাতেই আমি বিশ্বাস করেছি যে ঈশ্বর-প্রেরিত আপনি।

আবার কোনো কোনো সময়ে অন্ধকার যেন নেমে এসেছে,—স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে মেঘাবরণের বাধা,—সংশয়ের তরঙ্গ-বিক্ষোভের মাঝখানে আমার বিপন্ন আত্মা বিশ্বাস ও আশার যুগল নোঙ্গরের জন্য ক্লিষ্ট প্রার্থনা করেছে।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সুশীল রুদ্র আমার পরম সহায় ছিলেন। তাঁর স্নেহপ্রীতি আমার মহা অবলম্বন ছিল,—কিন্তু এইরূপ বিপন্ন বিশ্বাসের মুহূর্তে সরাসরিভাবে তিনিও আমাকে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারতেন না। তাঁর নিজেরও মনে নানা প্রকার সংশয় ছিল। খৃষ্টের প্রতি প্রদীপ্ত প্রেম সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধিবাদী মন আমারই মতো দোলায়িত হোতো নানা প্রশ্নে। অপর পক্ষে যখনই সাধু সুন্দর সিং-এর সংস্পর্শে আমি আসতাম তখনই তাঁর শিশুসুলভ আস্থা ও বলিষ্ঠ সাহস আমার মনকে নির্মল আনন্দরসে পরিপ্লুত করত। সুন্দর সিং ছিলেন গ্যালাহাডের মতো পুণ্যহৃদয় খৃষ্টান নাইট,—ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপ সর্বদা জাগরূক থাকত তাঁর অম্লান দৃষ্টিতে।

নানা সংশয়ে আমার মন যখন বিচলিত তখন ঈশ্বরের এক অমূল্য উপহারের মতো অ্যালবার্ট স্কুইটজারের এই গ্রন্থটি আমার হাতে এল। খৃষ্ট-জীবনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি সংক্রান্ত নিউ টেস্টামেণ্টের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে গভীর গবেষণা করেছেন, খৃষ্ট-জীবনীর সমস্ত খ্যাত অখ্যাত গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন, যীশুর প্রতি প্রতি যুগের বিরুদ্ধতা ও প্রতি যুগের বিশ্বাসকে তিনি তন্ন তন্ন করে বিচার করে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানব সমাজের প্রতি যীশুর দাবী অকুণ্ঠ আনুগত্যের দাবী।

আমার অব্যবস্থিত চিত্তের প্রতি এই ঘোষণার মূল্য সেদিন ছিল অপরিসীম। তাঁর এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল। খৃষ্ট-বিবরণ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা যুক্তি ও নানা ব্যাখ্যার অবসানে তিনি সমস্ত পাণ্ডিত্য পরিহার করে একনিষ্ঠ সাধুর অন্তরের ভাষায় এই পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন।

অ্যালবার্ট স্কুইটজার বলেছেন,—খৃষ্ট-জীবনের সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর উপর দাঁড় করালে সে জীবনের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করা যাবে না। সেই ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্র হবে বিবর্ণ নিষ্প্রাণ। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীরা যে বাস্তবতার কারাগার নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে খৃষ্টচরিত্রকে বন্দী করা অসম্ভব। কেন না, খৃষ্ট কোনো নির্দিষ্ট যুগের কোনো নির্দিষ্ট যুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ নন। সর্বকালের সর্বধারণার কেন্দ্রে তিনি বিরাজমান। তিনি নীতিশিক্ষক নন, তিনি মানববিবেকের সাম্প্রতিক অনুশাসক নন। তিনি মানবজাতির সর্বযুগের একচ্ছত্র সম্রাট,—মানবাত্মার সর্বসমর্পিত আনুগত্য তাঁর দাবী। যেখানে তাঁর চৈতন্যস্পর্শ,

সেখানেই তাঁর অনির্বচনীয় লীলা। এই লীলা তাঁর নিত্য আগমনীর সংকেত। খৃষ্ট যে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে এক অলৌকিক যুগ! সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা খৃষ্টের আবির্ভাব।

স্কুইটজার প্রশ্ন করেছেন,—খৃষ্টকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করতে সত্যই কি আমরা চাই? তাঁর নয়নজ্যোতিকে ধ্রুবতারা করে সর্বত্যাগী হয়ে শুধু তাঁরই অনুগামী হতে কি চাই তাঁর প্রথম শিষ্যবৃন্দের মতো? তর্কবাদী বলে, খৃষ্টের আশু পুনরাবির্ভাবের আশায় তাঁর প্রথম মনোনীত প্রেরিতগণ ভুল করেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত বাস্তবের গভীরে যে সত্য বিরাজমান ইতিহাসের নিকষে উজ্জ্বল রেখায় তা কি প্রমাণিত হয়নি? তাঁর আবির্ভাবের পর অতিবাহিত হয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী পার; ইতিহাসের প্রতি যুগে কোন্ বিচিত্র চুম্বক-আকর্ষণে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে নরনারীর আত্মা, আনন্দিত আত্মসমর্পণের আকুল আবেগে? সর্বভূতে সর্বকালের মানবহৃদয়ে অবিনশ্বর তাঁর স্পর্শ, এই কালজয়ী রহস্যের মূল কোথায়? একটিমাত্র সহজ স্বীকৃতিতে এই রহস্যের উদ্ঘাটন। স্বীকার করি,—তিনি নিত্য-আবির্ভূত, চির-উদ্ভাসিত, পরম সত্য তিনি।

মানব-ইতিহাসের এই মহান পুরুষ যীশুখৃষ্ট, বাস্তবতার পথে পথে তাঁর সন্ধানের সমাপ্তিতে অ্যালবার্ট স্কুইটজার তাঁর আশ্চর্য গ্রন্থে বলেছেন:

প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হন, নামহারা পরিচয়হারা রূপে, যেমন একদা হ্রদপ্রান্তে তিনি পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন। সেদিন ওরা তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেনি। আমরাও কি চিনতে পারি? সেদিনের মতো আজও তিনি আমাদের আহ্বান করেন, বলেন,—অনুসরণ করো আমাকে। এ যুগের মানুষের যা কর্তব্য, সে কর্তব্যের আহ্বান তিনি ধ্বনিত করেন আমাদের হৃদয়ে। এই নির্দেশ রাজ-আজ্ঞা,—এ আজ্ঞার প্রতিপালন মানবাত্মার ঐতিহাসিক অঙ্গীকার।

তাঁর আজ্ঞা যারা পালন করে,—তারা পণ্ডিতই হোক আর মূর্খই হোক,—তাঁর নির্দেশিত পথে শত যন্ত্রণা শত বন্ধুর বঞ্চনার মধ্যেও তারা তাঁর নিত্য-উদ্ভাসিত মূর্তির দর্শন লাভে ধন্য হয়। তাঁর অবর্ণনীয় লীলারূপকে তারা চিনতে পারে।

স্কুইটজার সেই চিরন্তন প্রভু যীশুখৃষ্টের সামনে আমাকে আবার এনে উপস্থিত করলেন,—আমার জীবনের সংশয়-কালিমামুক্ত প্রতিটি ভাস্বর মুহূর্তে যে প্রভুকে আমি চিনেছি, যে প্রভুকে আমি ভালবেসেছি। আমার মনে হোলো আমার নিভৃত অন্তরের গোপন কথাটি যেন পাঠ করেছেন স্কুইটজার,—সেই.কথাটিই উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে তুলে ধরেছেন আমার ধূসর দৃষ্টির সামনে।

স্কুইটজারের এই গ্রন্থ অপর একটি দিক থেকেও আমার মনকে অনুরূপ নাড়া দিয়েছিল। যীশুর ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্র অংকন মানসে তিনি খৃষ্টীয় সমাজের প্রথম শতাব্দীতে গিয়ে পৌছেছিলেন। সে যুগের খৃষ্টভক্তগণের অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ও লীলাবিভূতির প্রতি বিশ্বাসকে তিনি অল্প কথায় এড়িয়ে যেতে চান নি। যীশুর আশু পুনরাবির্ভাবের কথা ধর্মগ্রন্থের যেখানে যেখানে লেখা আছে, সেই সব লেখাগুলি তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন। খৃষ্টের প্রথম শিষ্যগণ অলৌকিককে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, স্কুইটজার পরম যত্নে সেই অলৌকিকের পটভূমিকা রচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

স্কুইটজারের এই রচনা পড়তে পড়তে আমিও আমার প্রথম জীবনে ফিরে গেলাম,—ফিরে গেলাম আমার পিতামাতার কাছে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসের আবেষ্টনীর মধ্যে। আমার পিতায় ধর্ম-বিশ্বাসের কথা আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হোলো, তার সঙ্গে আমার ধর্ম-বিশ্বাসের যোগসূত্র আমি রচনা করলাম।

আমার পিতামাতার বিশ্বাসের সঙ্গে আক্ষরিক ভাবে একান্ত হওয়া

আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতি পত্রে আমার পিতৃদেব আমাকে লিখতেন—যীশুর প্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎবাণী অচিরে সত্য হতে চলেছে, মনুষ্য-মূর্তি পরিগ্রহ করে যীশুর পুনরাবির্ভাবের আর বিলম্ব নেই। সেই আবির্ভাবের পথ চেয়ে তিনি বসে আছেন। শিশুর মতো সারল্য নিয়ে আমার পিতা বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এক লহমায় প্রকৃতির সব নিয়মকে তিনি বদলে দিতে পারেন।

আমার পিতার ছিল শিশুজনোচিত আস্থা। সেরূপ আস্থার অধিকারী না হয়েও আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এই বাস্তব সংসারের কেন্দ্রে এক অলৌকিক আনন্দ-জগৎ বর্তমান। কেন না, সেই আনন্দের আস্বাদ আমি পেয়েছি। এই মনুষ্য-ভাগ্যের মাঝখানে এক আত্মিক জীবনের প্রত্যাশা আমি করতাম,—যে জীবনের এপার ওপার জুড়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, ঈশ্বরের পরম সৃজন-করুণায় যে জীবন নব নব জীবনে প্রবাহিত। আত্মার এই অবিনশ্বর অসীমতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না আমার মনে।

আমার পিতৃদেবের বাহ্যিক চেহারাতেও প্রভু যীশুর দেহচিহ্ন ছিল। খৃষ্টোপম চরিত্র প্রকাশ পেত তাঁর মুখমণ্ডলে। মুক্তিদাতা পরম প্রভু খৃষ্টের চরণে তিনি তাঁর সমস্ত বিশ্বাসকে সরল শিশুর মতো অকিঞ্চন হয়ে সমর্পণ করেছিলেন। এই চিরবিশ্বস্ত আত্মদানে রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর চরিত্র, অপূর্ব-সুন্দর হয়েছিল তাঁর অন্তঃকরণ। খৃষ্টের পুনরাবির্ভাবকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে তিনি যে ভুলই করুন না কেন, সমস্ত ভ্রমকে তিনি জয় করেছিলেন বিশ্বাস দিয়ে আশা দিয়ে প্রেম দিয়ে। তাঁর খৃষ্ট-নিবেদিত জীবন যে উচ্ছলিত আনন্দ, অপরিম্লান আশা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে পরিপ্লুত ছিল, সেই আনন্দ, আশা ও ভক্তিকে আমার জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করতে যেন পারি, এই কামনাই ছিল আমার।

আমার পূর্বজীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে আমি পুনর্বার একে একে স্মরণ করতে লাগলাম। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সংযোগে মর্মমূলে বিশ্বাসের যে ভিত্তি রচিত হয়েছে, সেই ভিত্তির সুদৃঢ়তা আমি আবার

ধীরে ধীরে পরীক্ষা করে দেখলাম। কেন না, বিশ্বাসের এই ভিত্তির উপরেই আমাকে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার ধর্মের মর্ম-মন্দির,—ভিত্তিমূলের প্রস্তরকাঠিন্যে কোনো সংশয়ের দুর্বলতা থাকলে চলবে না।

আরো একটি বিষয়ে আমি অ্যালবার্ট স্কুইটজারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সাহায্য লাভ করেছিলাম। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। সমস্ত জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তের কর্ম দিয়ে স্কুইটজার নিঃশংক নিঃসংকোচে প্রত্যক্ষ যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর,--সঙ্গীতবেত্তা হিসাবে তাঁর ছিল দেশজোড়া খ্যাতি। কিন্তু শিক্ষকতা বা সঙ্গীতস্রষ্টার লোকরঞ্জক বৃত্তি পরিত্যাগ করে তিনি ডাক্তারী পড়লেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভ্য মানুষের অত্যাচার যে দেশের ললাটে গাঢ় থেকে গাঢ়তর কালিমা লেপন করেছে,–চিকিৎসকরূপে সেবার বৃত্তি নিয়ে সেই গভীর মধ্য আফ্রিকায় তিনি যাত্রা করলেন। আফ্রিকার বিষুববৈখিক অঞ্চলে ওগুই নদীর ধারে তিনি উপস্থিত হলেন ও ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

প্রতীচ্য সভ্যতার আওতার সুদূর প্রান্তে আফ্রিকার আদিবাসিগণের এই নগণ্য জনপদে স্কুইটজার রোগী ও মুমূর্ষুদের সেবায় তাঁর খৃষ্ট-নিবেদিত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। খৃষ্টের পথে জীবনকে পরিচালিত করেছেন তিনি সমস্ত পার্থিব পাথেয়কে পরিত্যাগ করে।

আফ্রিকার উষ্ণ-মণ্ডলের গভীর অরণ্যের উদার নির্জনতায় খৃষ্টের উপস্থিতিকে অন্তরের একান্ত নিকটে অনুভব করেছেন স্কুইটজার। ঈশ্বরের অলৌকিক নির্দেশ আজও তাঁর প্রতিদিনের কর্মধারাকে পরিচালিত করছে,—আনন্দ-অভিষিক্ত করছে তাঁর প্রতি মুহূর্তের সেবাব্রতকে। যীশুর নামে অবজ্ঞাত দীন-দরিদ্রের সেবায় তিনি তাঁর

সমগ্র জীবনকে দান করেছেন,—এই দানের আনন্দ তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনকে এক অনির্বচনীয় গৌরবে ভূষিত করেছে।

স্কুইটজার মনে করেন,—খৃষ্ট কোনো এত অতীত মনুষ্যচরিত্র নন, তাঁর পরিচয় শুধু প্রাচীন নথিপত্রের অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি যুগের মানবাত্মার মন্দিরে তিনি বিরাজমান। তবু তাঁকে সন্ধান করতে হয় যুগে যুগে।

এ সন্ধান সহজের পথে নয়,—যতো যুগ অতীত হচ্ছে, ততোই পথ হচ্ছে বন্ধুরতর, সন্ধানের বেদনা হচ্ছে তীব্রতর। প্রতি যুগের মানব-সমাজের বীর অভিযাত্রীর দল তাঁর সন্ধান করে, তাঁর স্পর্শ পায়, পরম ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে অর্জন করে। কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাও এই অভিযাত্রীরা আবদ্ধ নয়। তাঁব সন্ধান তাঁর পরিচয় দেশে দেশে। দেশাচারের লোকাচারের সমস্ত অর্গল তিনি ভেঙেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পরমোপলব্ধির যে সন্ধানী তাঁরই মতো তাকেও হতে হয় সর্ববন্ধনহীন।

তিনি আসেন,—সমস্ত বিচার তর্ক ও দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে তিনি আসেন,—মনুষ্যচেতনার আপাত পরাজয়ের অন্ধকাবেব প্রান্তে আসন্ন বিজয়-প্রভাতের' জ্যোতির্ময় বিভা ফুটে ওঠে তাঁর চবণস্পর্শে। তিনি মানব-সংস্কৃতির দিগন্ত অতিক্রমের পথপ্রদর্শক। তাঁর মৃত্যুতে নবজীবনের সংকেত। তাঁর জীবনদান পুনরুজ্জীবনের অংকুর।

পরবর্তীকালে ইউরোপে গিয়ে কিছুদিন অ্যালবার্ট স্কুইটজারের সঙ্গে একত্র বসবাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার মনে হয়, সাধু সুন্দর সিং ও জাপানের কাগাওয়া ছাড়া স্কুইটজারের মতো

এতো ঘনিষ্ঠ খৃষ্টানুসরণের অধিকারী আর কেউ এ যুগে হননি। তাঁর প্রেমোদ্ভাসিত আত্মত্যাগের কাহিনীর সঙ্গে আজ সমস্ত পৃথিবী পরিচিত। তাঁর অনন্যসাধারণ খৃষ্টভক্তির কথা আজ কারো অজানা নয়। যে যীশুকে তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পূজা করে চলেছেন, তাঁর প্রত্যক্ষ রূপ প্রতি-বিম্বিত হয়েছে স্কুইটজারের চরিত্রে,—যে চরিত্রে শিশুর সারল্য-সৌরভ নিত্য বিকশিত।

স্কুইটজারের গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে আমি একটি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলাম। বাল্যকালে পিতৃগৃহে যে ধর্মশিক্ষা আমি পেয়েছিলাম, তার পিছনে ঈশ্বরের অবশ্যই কোনো অভিপ্রায় ছিল। সেই শিক্ষার স্মৃতি আর স্কুইটজারের এই গ্রন্থ একত্রে আমার মনকে উদ্বেলিত করে তুলল। যতো সামান্য যতো অকিঞ্চিৎকরই হোক না আমার জীবন—প্রত্যক্ষ যীশুর সন্ধানে আমিও কি পথে বার হতে পারি না? প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্তবে যে অলৌকিক বিশ্বাস ছিল,—আমার কর্মে ও প্রার্থনায় সেই বিশ্বাসকে কি পুনর্জাগরিত করতে পারি না? যুগে যুগে মানুষের যেখানে বেদনা, মানবাত্মার যেখানে নিপীড়ন,—সেইখানেই খৃষ্টের আবির্ভাব। মানবভাগ্যের সেই বেদনা-বঞ্চনার মধ্যেই আমি আমার প্রভুকে সন্ধান করব। শুধু মুখের মন্ত্রে নয়,—তাঁর প্রিয় কার্যের যন্ত্র হয়েই আমি তাঁব উপাসনা করব। তাঁর নামে জীবনকে উৎসর্গ করব সর্ব মানবের সেবায়। সেই হ্রদের ধারে তাঁর প্রথম শিষ্যরা প্রভুকে যেমন দেখেছিল, প্রভুর কথা যেমন শুনেছিল,—আমিও কি আমাব প্রভুকে উপলব্ধি করতে পাবব না তেমনি করে,—সর্বস্বহারা হয়ে সেবা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে? আমিও কি শুনতে পাব না তাঁর অমোঘ-অমৃত বাণী,—'বৎস, অনুসরণ করো আমাকে।'

যন্ত্রণা-শিহরিত এই যুগ, রোগজর্জর এই পৃথিবী। সংশয় আর বেদনা, অবিশ্বাস আর রোদন। খৃষ্টজন্মের প্রথম শতাব্দীতে প্রথম

ভক্তগণের অন্তর পুণ্য আত্মার যে অপূর্ব গুণাবলীতে মণ্ডিত ছিল, সেই ভক্তি সেই বিশ্বাস সেই সারল্যকে আবার যদি এ যুগে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই একমাত্র মঙ্গল। এ আমি স্থির বুঝেছিলাম, আমাদের আবার সেই প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টান হওয়া প্রয়োজন।

শিশু উত্তেজনা ও স্বল্প অভিজ্ঞতার ফলে আদিম ভক্তমণ্ডলী যীশু খৃষ্টের পুনরাবির্ভাবের সমস্যাটির নিতান্ত সহজ সমাধান করেছিলেন। আমার সরল বিশ্বাসী পিতার মতো তাঁরাও প্রভুর কথার নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব মিথ্যা নয়। পাপ-কলুষিত মৃত্যু-বিধ্বস্ত ধরণীতে খৃষ্টের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় স্পর্শে নবপ্রাণের ও নবপুণ্যের সঞ্চার,—এই বিশ্বাস খৃষ্টবিশ্বাসীর হৃদয়-কেন্দ্রের চিরঞ্জীব বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই সাধুগণের সুসমাচার।

শতকলুষ সত্ত্বেও এই ধরণী ঈশ্বরের রাজ্য,—এই রাজ্যের ঘোষণা করেছেন ঈশ্বর-পুত্র মহামানব যীশু। যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক ভক্তগণ প্রভুর অতীন্দ্রিয় লীলার প্রকাশ স্বচক্ষে দেখেছিলেন,—প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁরা এই অলৌকিক স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। সেই স্বর্গরাজ্যের প্রত্যক্ষ পুণ্যের অধিকারে তাঁরা ব্যাধিজর্জরকে সুস্থ করেছিলেন অন্ধকে করেছিলেন চক্ষুষ্মান্। প্রশ্ন ছিল,—প্রশ্নের উত্তরও ছিল,—কেন না প্রভু খৃষ্ট ছিলেন সর্বদা কাছাকাছি। ঈশ্বর-রাজ্যের দ্বার ছিল সামনাসামনি।

খৃষ্ট-সন্নিহিত ভক্তগণের অধুনা-বিরল বিচিত্র উদ্দীপনার পরিচয় সাধু জন লিখিত সুসমাচারের শেষের দিকের বর্ণনায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এমন স্পষ্টভাবে চিত্রটি অংকিত হয়েছে যে, সমস্ত দৃশ্যটি যেন আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। সমুদ্রতীরে প্রিয় শিষ্যগণকে যীশুর শেষ দর্শনদানের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

এই কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল যে, যীশুর প্রিয় শিষ্য দেহত্যাগ

করবেন না,—যতো দিন না প্রভু আবার আসেন ততোদিন প্রতীক্ষা করবেন। সেই জন্য যীশুর তরুণ পথযাত্রিগণের কাছে প্রকৃত কাহিনী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়েছিল। জন সেই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন,—'কিন্তু যীশু বলেননি যে, প্রিয় শিষ্য মরবেন না। তিনি শুধু অন্যান্য ভক্তদেব বলেছিলেন,—আমি যদি ইহা ইচ্ছা করি যে এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমাদের কি? তোমরা শুধু আমাকে অনুসরণ করো।'

আমরা আমাদের মনশ্চক্ষে কল্পনা করতে পারি,—খৃষ্টের শেষ প্রত্যক্ষ শিষ্য তাঁর নশ্বব জীবনাবসানের দিনটি পর্যন্ত বৃদ্ধ কণ্ঠে তরুণ শিষ্যদের কাছে খৃষ্টের অলৌকিক জীবনী শোনাচ্ছেন। পরম-প্রভুর এই জীবনী তিনি শুনিয়েছেন শত সহস্র বার যত দিন না মৃত্যু এসে কণ্ঠরুদ্ধ করেছে। প্রভু আসবেন, প্রভু আসবেন, প্রভু আবার মরদেহে অবতীর্ণ হবেন,—এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করা শক্ত নয়। এই বিশ্বাসের বলেই বাহ্যিক জগতের নিগড় শিথিল হয়,— যেখানে প্রভু যীশু নিত্যকাল অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই অনন্ত রাজ্যের আহ্বানে আকুল হয়ে সাড়া দেয় বিশ্বাসী-আত্মা।

যীশুখৃষ্ট অবিলম্বে আবার মরদেহে পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত হবেন, প্রভুব প্রথম ভক্তগণেব মনে অটুট ছিল এই বিশ্বাস। খৃষ্টীয় সমাজের প্রথম যুগে এই বিশ্বাস যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বোধ হয় ঈশ্বরেবই মঙ্গলময় অভিপ্রেত।

সে যুগের খৃষ্টবিশ্বাসী নরনাবীরা ছিল অতি সবল, অতি দীনহীন,—কোনো বিবাট ঐতিহ্য ছিল না তাদেব পিছনে। অবিশ্বাসী পরুষ শক্তির হাতে যে প্রচণ্ড অত্যাচার তারা সহ্য করেছিল,—সেই অমিত সহ্যশক্তি তারা পেয়েছিল কোথা থেকে? প্রভু আবার আসবেন, আসার দেরি নেই,—এই ধ্রুব আস্থাই সেই দীন খৃষ্টানদের বুকে দিয়েছিল বল। যে কল্পনা নিতান্ত সহজ, যে আশা নিতান্ত বাস্তব, যে সংকেত নিতান্ত প্রত্যক্ষ—তারই তখন প্রয়োজন ছিল। তাই নৃশংসতম অত্যাচারের

অগ্নিপরীক্ষাতেও ত্রব হয়নি তাঁদের অবিচলিত খৃষ্টপ্রেম। সেই বিশ্বাসকে নিতান্ত স্থূল বিশ্বাস বলে অতীতের সেই অকুতোভয় খৃষ্টপথযাত্রীদের হেয় করবার অধিবার আমাদের নেই।

বৃদ্ধ জন উপদেশ দিয়েছেন,—'পৃথিবীকে প্রেম কোরো না, আকৃষ্ট হোয়ো না পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি। যদি কোনো ব্যক্তি এই নশ্বর পৃথিবীকে ভালোবাসে, পরম-পিতার প্রেম থেকে সে বঞ্চিত হয়। কেন না পৃথিবীর যা কিছু সঞ্চয়—দেহের বাসনা, ইন্দ্রিয়ের লালসা ও মরজীবনের গর্ব,—এ সবই পৃথিবীর, ঈশ্বরের নয়। এই পার্থিব সঞ্চয় ফুরায়, জুড়ায় জীবনের বাসনা-কামনা,—কিন্তু ঈশ্ববেব কার্য যে কবে সে চিরদিন জীবিত থাকে। হে শিশুগণ, মনে রেখো,—শেষের প্রহর উপস্থিত।'

শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজছে। এ যেন জীবন-মৃত্যুর এক চরম সন্ধিক্ষণ,—আর দেরি নেই,—যাব কি যাব না, নেব কি নেব না তোমার আশীর্বাদ,—চলব কি চলব না তোমার আদিষ্ট পথে। নিঃশংক নিঃসংশয় করতে হবে মনকে এই মুহূর্তে। সংযত করতে হবে মেখলা, জ্বালতে হবে অভিসারের বন্ধুব পথের হৃদয়-প্রদীপ। খৃষ্টধর্মগ্রন্থের মূলে এই অবিলম্ব আত্মপ্রস্তুতির সুরটি বাজছে। এই গ্রন্থে নানা সুরেব ঐক্যতান—কিন্তু তার মধ্যে মূল সুরটি হৃদয়তন্ত্রীর প্রধান ঝংকারের মতো। এই ঝংকার ঘুম ভাঙায়, ঘুচিয়ে দেয় অলস স্বপ্নের মায়াজাল।

খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়—পরম সত্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে সত্যের পরম প্রকাশ,—ক্রুসের যূপকাষ্ঠে সে সত্যকে হত্যা করা যায়নি।

এই ক্রুসের যারা অনুবর্তক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের প্রস্তুত

হয়ে থাকতে হবে। কে জানে কখন প্রভু আবির্ভূত হবেন, বলবেন,—অনুসরণ করো আমাকে। এই আহ্বান হয়তো বা মধ্যরাত্রির তিমিরান্ধকারকে ভেদ করে কানে বাজবে,—হয়তো বা সেই হ্রদতীরের প্রত্যূষের মতো নবোদিত সূর্যের আনন্দবীণায় ধ্বনিত হবে সে আহ্বান। একান্ত অপ্রতীক্ষিত মুহূর্তে স্পন্দিত হবে তাঁর চির-প্রতীক্ষিত পদধ্বনি।

এই প্রতীক্ষার পরম অবসানে নবজীবনের সূচনা। পৃথিবীর আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ, মরজীবনের বাসনা-কামনা মানবাত্মাকে পঙ্গু করে রাখে। কিন্তু সেই আহ্বান যার প্রাণে বাজে,— সে পঙ্গু হয়েও গিরি উল্লংঘনের শক্তি লাভ করে, এক মুহূর্তে অপহৃত হয় তার সর্বশ্লথভাব। অন্ধকার হৃদয়কন্দরে মহাজীবনের নব উদ্দীপনার আলোক-বর্তিকা মুহূর্তে জ্বলে। তার আর কিছু থাকে না, কিছু সে সঞ্চিত রাখে না পৃথিবীর জঞ্জাল,—তার সব কিছু গ্রহণ করেন প্রভু খৃষ্ট।

দুর্বলতা ও সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার ক্লিষ্ট অন্তরে অ্যালবার্ট স্কইটজারের গ্রন্থ সেই অমূল্য আলোক-বর্তিকাটি স্থাপন করল। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ আমাকে ঠেলে দিল দীন দরিদ্রের মধ্যে,—যারা সর্বহারা ও ভাষাহারা তাদের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ করল আমার আত্মার আত্মীয়তা। আমি আমার বইপত্র ফেলে আবার পথে বার হতে শুরু করলাম—ঘুরতে লাগলাম গ্রামে গ্রামে। সরল গ্রামবাসীদের সাহচর্যে মানবজীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। ক্রমে আমার মন ধীরে ধীরে একনিষ্ঠ বিশ্বাসের গৌরবে নিষ্কলুষ হয়ে উঠল। আমার হৃদয়ের মাঝখানে ভক্তি ও বিশ্বাসের বর্তিকায় পরম মঙ্গলময় পিতা আপন হাতে অমলিন ও আশা-প্রোজ্জ্বল শিখাটি জ্বেলে দিলেন। যে আহ্বানের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম,—সেই আহ্বান আমার প্রাণে এসে মন্দ্রিত হোলো।

আমার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিন এল, যেদিন শেষ পর্যন্ত কেম্‌ব্রিজ মিশন ভ্রাতৃসংঘ পরিত্যাগ করব বলে আমি মন স্থির করলাম। স্থির করলাম,—কোনো বিশপের অধীনে নির্দিষ্ট ধর্মযাজকবৃত্তি আর আমি করব না, জীবন-তরণীকে অজ্ঞাত সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব বৃহত্তর ও মহত্তর পৃথিবীর সন্ধানে।

ধৈর্যহীন হঠকারিতার সঙ্গে এই পন্থা আমি বেছে নিইনি। মানসিক অস্থিরতা ও সংশয়ের মধ্যে বহু বৎসর কেটেছে। সম্মুখে অগ্রসর হয়েও শারীরিক কারণে আমি নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে পশ্চাৎপদ হয়েছি। কিন্তু হৃদয়ের হ্রদতটে আমার জীবন-প্রভুর সেই প্রত্যুষ-মুহূর্তের ডাক বাবে বাবে বেজেছে,—প্রাণের মধ্যে ঝংকৃত হয়েছে সেই আহ্বান, 'চলো চলো, অনুসবণ কবো আমাকে।'

শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছি সেই আহ্বানে।

আমাব জীবনের এই পবিবর্তন সামান্য একটা ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনার বিবরণ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাব পূর্বে যতোদিন আমাব অন্তরের অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে আমি কাটিয়েছি,—সিদ্ধান্ত এবং সংশয়েব দোলায় দুলেছি,—ততোদিন আমার প্রভু যীশুখৃষ্টেব যে মূর্তি আমার অন্তব-দর্পণে অহরহ প্রতিফলিত হয়েছে, সেই মূর্তির পরিচয় আমি দিতে চাই। খৃষ্টেব এই প্রতিকৃতির কয়েকটি প্রধান বেখা অ্যালবার্ট স্কুইটজারেব গ্রন্থে স্পষ্টরূপে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি আমাব নিজেরই দেখা। সেই মূর্তি আমাব অন্তর্দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল,—সেই মূর্তির ধারণা থেকেই বোঝা যাবে কোন পথে আমি চলেছিলাম, কেন নিরাপদ আশ্রয়কে পরিত্যাগ করে অপরিচয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, কে আমাকে জীবনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সংকল্প গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল !

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর যখন আমি দিল্লীতে ছিলাম তখন দেখেছি এই ভারতবর্ষের চেহারা ঠিক যেন উনিশ শতাব্দী পূর্বেকার রোমক সাম্রাজ্যের চেহারা। বাহিরে এক বিরাট নিশ্ছিদ্র সাম্রাজ্যবাদী শান্তি, অস্থিরতার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না সেই কঠোর শান্তির রাজত্বে। কিন্তু এই শান্তি নিতান্ত বাহ্য। মাটিব নিচে আগ্নেয়গিরির গহ্বরে যেমন লাভা-প্রবাহ ফোটে, তেমনি এই শান্তির গোপন কন্দরে এক মহা অশান্ত অন্তর্জ্বালা ভীষণ প্রদাহে টগবগ করে ফুটছে,—কোথাও কোথাও মাটি ফেটে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে দুরন্ত আবেগে। লোকমুখে এব নাম জাতীয় আন্দোলন, কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই আক্ষেপের শক্তি ও বিস্তার নিতান্ত আন্দোলনের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আমি স্থির বুঝেছিলাম,—এক বিবাট মহাদেশব্যাপী মানবসমাজ এক অন্তর্গূঢ় সাধনার আবেগে মথিত হচ্ছে। সে সাধনা নূতন ধারায় আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা।

মানবতার এই আত্মসন্ধানের নিগূঢ় আবেগ বাইবেলেব আদ্য গ্রন্থে সুস্পষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সৃষ্টিপূর্বেব অন্ধকাব নিরবয়ব বিশৃঙ্খলার রাজ্যে পরমাত্মার অনন্ত সৃজনীশক্তির কী অনির্বচনীয় প্রকাশ! সেই চরাচরবিহীন অন্ধকার-সমুদ্রে পবমেশ্বরের স্পর্শ জাগল, ঈশ্বর বললেন,—'আলোকের জন্ম হোক।' আলোকের জন্ম হোলো।

রোম সাম্রাজ্যে বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু গ্যালিলি এবং সমগ্র মধ্য প্রাচ্য তখন আসন্ন বিস্ফোরণের নিগূঢ় আবেগে স্পন্দিত হচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে খৃষ্টের আবির্ভাব হোলো। মানব-সমাজের এই অন্তর্বিপ্লব গ্যালিলিতে ধর্মের পথে অগ্রগতি খুঁজে পেল। ন্যাজারেথের তরুণ সূত্রধর যীশু তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানবমনের এই বিশাল উদ্বেলন প্রত্যক্ষ করলেন, লক্ষ্য করলেন সমাজের মধ্যে নব নব শক্তির সদ্য জাগরণ। অকুতোভয়ে তিনি

ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে—সেই আন্দোলনকে পরিচালনা করলেন ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে।

যীশু একলা ছিলেন না। নিঃসঙ্গ পথিক তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন জননেতা। ঈশ্বররাজ্যের ঘোষণা ইতিমধ্যে তখনই ধ্বনিত হয়েছিল আর্ত মানবের অন্তর-অন্ধকারে। ঈশ্বর আসবেন,—যুগে যুগে মানবাত্মার বিপদে তিনি যেমন এসেছেন, উদ্ধার করেছেন সৃষ্টিকে,—তেমনি আবার তিনি আসবেন। গ্যালিলির দিকে দিগন্তরে পথে প্রান্তরে সকল মানুষের মন এই আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। হাটের পথে বা সান্ধ্যসভায় গ্রামের চাষীরাও এই আশার কথা আলোচনা করত।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যীশু। এক বিপুল যুগনাট্যের অবতারণা করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন উৎসুক প্রাণের সেই সুসংবাদ,—তিনি আসছেন, মুক্তির আর বিলম্ব নেই। ডাক দিয়েছিলেন তিনি অবজ্ঞাত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে। গ্রামেব কৃষক আর হ্রদের ধীবরদের মধ্য থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁব তরুণ শিষ্যগোষ্ঠী। যীশু ছিলেন সমর্থ যুবা, তার শিষ্যরাও ছিলেন বলিষ্ঠ তরুণ,—পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। মনুষ্যহৃদয় কর্ষণ করবেন তাঁবা,—তাঁরা হবেন মনুষ্যভাগ্য-জলধিব নিঃশংক ধীবব।

শুরু হোলো যীশুর অভিযান। অন্ধ পেল দৃষ্টি, বোগী পেল পরিত্রাণ। অবমানিত দরিদ্রের কানে ধ্বনিত হোলো মুক্তিব মহাশ্বাস। ঈশ্বরের নবরাজ্যের স্বর্ণসিংহদ্বার ঐ বুঝি দেখা যায়!

ঐ বুঝি নবজীবনের ইশাবা! তরুণ ভক্তগণের বাঁধনছেঁড়া উন্মাদনা। পুরাতনের অর্গলকে তারা খসায়, সংস্কারকে তারা পাশে ছুঁড়ে ফেলে জয়যাত্রার উন্মুক্ত পথ থেকে।

জীবনে লেগেছে নব জোয়ার,—চেতনা ও আদর্শের নব নব রূপ তারা সৃষ্টি করে চলে। ঈশ্বররাজ্যেব আনন্দসুধা অন্তর পরিপূর্ণ করে

উপছিয়ে পড়ে,—প্রাচীনের ছিন্নভিন্ন জীর্ণ বসনকে পরিত্যাগ করে উৎসবের নবীন রঙিন পোষাকে সজ্জিত হয় মানুষ। যৌবনের অমিত বলিষ্ঠতায় মুক্তির এই অভিযানে সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যীশু।

এই বিপুল আনন্দনাট্যের প্রদীপ্ত চলিষ্ণুতার মধ্যে প্রথম বেদনার ছায়া পড়ল,—যখন মূঢ় বাতুলের মতো তথাকথিত পণ্ডিত আর ফরীশীর দল কোনো আহ্বানে কর্ণপাত করল না। প্রাচীন জীর্ণ ধাবণাকে আঁকড়ে ধরে তারা মুখ ফিরিয়ে রইল অন্ধকারে,—নবজীবনের উদ্ভাসিত ক্রীড়াঙ্গনে জনগণের সঙ্গে এসে যোগ দিল না। বারে বারে তাদের ডাকলেন সাধু জন, ডাকলেন প্রভু যীশু নিজে,- কিন্তু ঈশ্বর-রাজ্যের পবম সত্যেব আহ্বান তাদেব নিরুদ্ধ অন্তবে কোনো সাড়া জাগাতে পাবল না। যুগ-সঞ্চিত সংস্কাবেব স্তূপ পাথরের মতো তাদের বুকে বসে আছে। জাতিভেদের সংকীর্ণতায় তারা আবদ্ধ, তাদের অনড় চৈতন্য ঘিরে সূচিভেদ্য পৌরাণিক অন্ধকার,--সেই অন্ধকারে নবাকণের আলোক-স্পন্দন জাগে না। অন্ধ প্রজার অন্ধ রাজার মতো তাবা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়,—মূর্খ আত্মাদরে ভাবে যে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি বুঝি তাদের হাতেই আছে। সে চাবি চিরকালের মতো তাদের বদ্ধমুষ্টি থেকে কবে খসে পড়েছে তা তারা জানেও না।

কিন্তু যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যৌবনের অকুতোভয় অভিযানে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। মৃত অতীতের মলিন চীর খসে পড়েছে তাঁদের দৃপ্ত অঙ্গ থেকে। তাঁরা নবীন যুগের প্রতিভূ। ঈশ্বরের রাজ্যে নূতন শক্তির নবোন্মাদনার স্ফুরণ লক্ষ্য করে যীশুর উল্লাসের অবধি নেই। এই নবযুগের বাতাসকে দুরন্ত ঝটিকার মতো দিকে দিগন্তরে বিস্তৃত করতে যীশু চান,—এই নবযুগের নবীন বিশ্বাসীদের তিনি সাগ্রহে আহ্বান করেন। একথাও তিনি বলেন,—'যারা

দুর্দাম, স্বর্গরাজ্য তাদেরই,—শক্তির দ্বারাই এই রাজ্যকে জয় করতে হয়।’

খৃষ্টের এই বাণী যৌবনের প্রতি যৌবনের আহ্বান। সম্মুখে জীবন-মরণের লড়াই,—হয় জয় হয় না হয় পরাজয়, হয় আলোক না হয় অন্ধকার।

নব বিশ্বাসের এই যে অভিযানে যীশুখৃষ্ট আগুয়ান হলেন, অন্তরপ্লাবী আনন্দই ছিল এই অভিযানের পাথেয়। মৃত্যুপণ জীবন-লীলা এই অভিযান,—এ যেন এক বিবাহ-উৎসব। বাঁশী বাজছে, চলেছে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা। এসো এসো, বিলম্ব কোরো না কেউ। ধ্বনিত হচ্ছে আশার গান,—চোখ কান বন্ধ করে উপবাসী মন নিয়ে দূরে সরে থেকো না কেউ। আজ উৎসব-ভোজের দিন,—উপবাসের দিন নয়।

উপবাস করতে হবে বৈকি,—সইতে হবে অনেক যন্ত্রণা। আত্মাহুতির যন্ত্রণা-শিহরিত আসন্ন মুহূর্তও যীশু তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এই বেদনা এই আত্মদান ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠারই ভিত্তি। কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই, ভয় নেই। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, যন্ত্রণা আসুক আনন্দ আসুক, ভাগ্যে জুটুক আহার বা অনশন,— ভক্তের কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিত হোক পিতার নাম,—স্বর্গরাজ্যের মতো মর্তভূমিতেও প্রতিষ্ঠিত হোক পরম-পিতার সিংহাসন। ত্রিভুবনে বিস্তৃত হোক তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।

এই নাটকের পরমতম ঘটনা, শ্রেষ্ঠতম সংলাপ যীশুর একটি কথা একটি ডাক। পিতা বলে তিনি ডেকেছিলেন ঈশ্বরকে,—এই ডাকই নবযুগের নববিধান। নিপুণ সুরকার যেমন তাঁর বীণাযন্ত্রে একটি

রাগিণী বারে বারে বাজান, খেলাচ্ছলে রাগিণীর মধ্য থেকে অমৃত সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন,—তেমনি যীশু নানা ভাবে নানা মূর্ছনায় ঐ 'পিতা' নামটি উচ্চারণ করেছিলেন,—এক অনন্ত গৌরবে মহিমান্বিত করেছিলেন ঐ নাম।

যীশু অপেক্ষা এই আহ্বানের মহত্তর অধিকারী কে? তাঁর মতো করে ঈশ্বরকে পিতা বলে আহ্বান করতে আর কে পারে? যীশুরই মধ্যে শিশু মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ,—যে শিশু নির্ভীক ও নিত্যবিশ্বস্ত দৃষ্টি মেলে ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে তাকায়,—যে শিশু সবল যে শিশু সত্যকাম,—অকুণ্ঠ আস্থা ও সহজ সাহসে যে শিশু স্রষ্টার চরণে প্রণমিত! যে শিশু তার সহজাত অনুভূতি দিয়ে জানে যে এ সংসার সুন্দর,—কেন না এ সংসার তার পিতার সৃষ্টি। পিতার প্রাসাদে সে জন্মেছে,—কতো বিচিত্র হর্ম্য, কতো মনোরম প্রকোষ্ঠ এই প্রাসাদে,—কী মনোরম তার আশ্রয়! পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত তার হৃদয়, স্থির বিশ্বাসে সে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে।

পরম-পিতাকে যীশু যেমন জানেন তেমন আর কেউ জানে না। পরম-পিতার মহিমা যীশু যেমন প্রকাশ করতে পারেন, তেমন আর কেউ পারে না। যীশুর এই শক্তির মূলে রয়েছে তাঁর আশ্চর্য জন্মরহস্য। যীশু ও তাঁর পিতা, তাঁরা দুজনে এক। পরম-পিতার সাক্ষাৎ পুত্র তিনি,—এ কোনো তত্ত্বকথা নয়, এ কোনো পাণ্ডিতের তর্কের বিষয়বস্তু নয়,—এ উপলব্ধির কথা। তিনি পরম-পিতাকে ধ্যানোপলব্ধি করেছেন, পরম-পিতার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন তাঁর অস্তিত্ব,—কী চরিত্রে কী ইচ্ছায় কী সাধনায় যীশু ও পরমেশ্বরের মধ্যে কোনো অনৈক্য নেই।

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যীশু জগৎ-সংসারের সম্মুখে পরমেশ্বরের যে রূপ প্রকাশ করেছেন তার তুলনা নেই। সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে পূর্বযুগের সমস্ত ধারণা ও সংস্কারকে দূর করে এক পরমাশ্চর্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছেন যীশু। মানব-ভাবনায় এই যে পরিবর্তন,—এ পরিবর্তন এতো মৌলিক, এতো উদার অথচ এতো

সহজ! খৃষ্টীয় ধর্ম পূর্বতন ধর্মবিকাশের চর্বিত চর্বণ নয়,—এই ধর্মে মানব-ইতিহাসের এক নবীন অধ্যায়ের সূচনা।

কেন না,—যীশুখৃষ্ট ঘোষণা করেছিলেন,—ঈশ্বরের চরিত্র শিশু-চরিত্রের মতোই সরল, অন্তর যাদের পবিত্র তারা তাদের ধ্যান-দৃষ্টিতে ঈশ্বরের শিশুরূপই দেখতে পায়। শিশুর মতো নিষ্কলুষ যার চরিত্র,—সেই লাভ করে ঈশ্বর-সন্নিধি, ঈশ্বরের রাজ্যে সেই পায় প্রবেশাধিকার।

যীশু বলেছেন,—'যতোদিন না তোমাদের মনের পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যতোদিন না তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতো হও, ততোদিন কিছুতে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে না।' পাছে লোকে না বোঝে তাই এই উপদেশ তিনি বারে বারে দিয়ে বলেছেন,—'ছোট হও, অবনত করো নিজেকে; যে ঐ ক্ষুদ্র শিশুটির মতো অবনত, সেই পাবে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ স্থান।' আবার তিনি বলেছেন,—'ঐ ক্ষুদ্র শিশুর মতো না হলে সে স্বর্গরাজ্য লাভ করবে না,—সে করবে না আর কিছুতেই।'

আমরা সকলেই জানি, শিশুদের মধ্যে সংস্কারের কোনো বাধানিষেধ নেই। অর্গল ভাঙার সরলতা শিশুদের মধ্যেই আছে। ঈশ্বরের সত্যের কেন্দ্রেও এই সংস্কারবিহীন সারল্য। আধুনিক যুগের বিরাট বস্তুতান্ত্রিক প্রগতি যেমন বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি সরল সূত্র থেকে বিসর্পিত হয়েছে, তেমনি এই অসীম আধ্যাত্মিক জগৎও ঈশ্বরের অতি সহজ ও অবিনশ্বর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে যীশু মানব-জীবনের বাস্তবতার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

যীশু এই আশ্চর্য সত্য প্রচার করেছেন যে,—যেমন স্বর্গরাজ্য তেমনই ঈশ্বর। স্বর্গরাজ্যে সরল শিশুদের প্রবেশাধিকার সর্বাগ্রে। ঈশ্বরও এই শিশুরই মতো সরল। শিশুরই মতো তিনি সহনশীল, শিশুরই মতো তিনি আত্মসমর্পিত। তিনি নত, তিনি নম্র। ভক্তের হৃদয়কে

তিনি যখন যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁর নম্রতার অন্ত নেই। ভক্তের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করে থাকেন, অনন্ত সহিষ্ণু এই প্রতীক্ষা। তাঁর সবচেয়ে বিদ্রোহী সন্তানদেরও তিনি শাসন করে বশে আনতে চান না। প্রেমেই তাঁর শাসন, প্রেমই তাঁর জয়।

বিপথগামী সন্তানের প্রতি তাঁর কী আশ্চর্য মধুর ব্যবহাব! কী প্রেম, কতো তিতিক্ষা! পুত্র আবার গৃহে ফিরে আসছে এই সংবাদ পেয়ে পিতা ছুটে বার হলেন পথে। এখনো অনেক পথ বাকি, পিতা সেই পথ পার হলেন দৌড়তে দৌড়তে। স্নেহালিঙ্গনে পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। —না, না পুত্র, অপরাধ স্বীকার করতে হবে না, অনুতাপ করতে হবে না,—যা ঘটেছে তা মৃত অতীত, অতীতকে ভুলে যাও।

সত্যই যীশু বলেছেন,—'অনুতপ্ত পাপী যেদিন পিতৃগৃহে ফিরে আসে সেদিন স্বর্গরাজ্যে মহা উৎসবেব দিন।'

ঈশ্বরের অনুকম্পাব সীমা নেই, ক্ষমাব সাগব তিনি। এই ক্ষমার কণাটুকু মাত্র মানুষ তার হৃদয়ে ধারণ করুক। যীশু বলেছেন,—

'যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের কল্যাণ করো। যারা তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহাব করে, তোমাকে অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা কবো। তবেই তুমি পরম-পিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পাববে। ভালো ও মন্দ, উভয়েবই মাথায় ঈশ্ববের সূর্য কি ওঠে না? সৎ ও অসৎ, উভয়েরই শিয়রে ঈশ্বরের বর্ষা কি ঝবে না? পবমেশ্বর সর্বত্রুটিহীন,—সর্বদোষহব তিনি। তোমাকেও হতে হবে তোমার পিতাবই মতো।'

এমন সহজ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে এসব কথা বলতে যীশুর পূর্বে আর কোনো মানব-সন্তান সাহস করেনি। ঈশ্বরেব এই যে সহজ সরল প্রেমবিহ্বল চরিত্র,—এই চরিত্র নিয়েই সৃষ্টির মর্মমূলে তিনি আসীন। তিনি উপলব্ধি-পারের দূব-দূরান্তের উদাসীন সৃষ্টিকর্তা নন।

একটি পাখির মৃত্যু-বেদনা তাঁর প্রাণে স্পন্দিত হয়, একটি মানুষের মাথার কটি চুল তাও তিনি গুণে রেখেছেন। তাই যখন নশ্বর মানুষ তার অন্তরাত্মার অমোঘ আহ্বানে পুরাতনকে বর্জন করে নবীনের অভিযানে আগুয়ান হয়,—সে আহ্বান ঈশ্বরেরই আহ্বান। সেই আহ্বান সৃষ্টির প্রথম বাণীর প্রতিধ্বনি,—যে বাণীর নির্দেশে চরাচরব্যাপী অন্ধকারের গর্ভে আলোকের জন্ম হয়েছিল। সে আহ্বানে যারা অবিশ্বাস করে,-তারা ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রতিভাকে অস্বীকার করে, আলোককে অস্বীকার করে অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। আলোকই দেয় ভবিষ্যতের পথনির্দেশ। এই ভবিষ্যৎকে ভয় করতে নেই। সৃজনধর্মী আবেগে এই ভবিষ্যতের পথে আগুয়ান হতে হয়।

ঈশ্ববেব সৃষ্টিলীলার ছেদ নেই। পুবাতনকে তিনি নবীন করেছেন,— মৃতকে তিনি সঞ্জীবিত করেছেন পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে। মানুষেব মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান নিত্য-আগুয়ান শিশুমন আছে সেই মন তাঁর আপন মনের আবেগে স্পন্দিত হোক, এই তাঁব অভিলাষ। এই শিশুমন নিয়ে যখন তাঁকে পিতা বলে ডাকি,—তখনই তাঁর মনে মন মিলাই. তখনই তিনি চরিতার্থ হন।

ঈশ্ববের এই পরম-শুভ নব-আহ্বানেব প্রমাণ যদি আমরা চাই. দার্শনিক তত্ত্ব ও তর্কেব বাগাড়ম্ববে যীশু সেই প্রমাণ দেননি। প্রমাণ তাঁব জীবন। ঈশ্বরের বাণীই তাঁর জীবন। আপন জীবন দিয়েই তিনি তাঁব পরম-পিতার সেই আহ্বানেব সত্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁব নিজের পার্থিব জীবনে প্রতি মুহূর্তেব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই পবীক্ষার পথে কোনো বাধা কোনো বিপদকে তিনি মানেননি। এই পরীক্ষায় চবম আত্মনিবেদনের অটল সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন। মানুষকে কোনো মহৎ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ কবতে হলে সে বিশ্বাসের জন্য জীবন নিবেদন করতে হয়। যীশু তা কবেছেন।

যীশুর এই দৃঢ় প্রত্যয় আর সাধারণ মানুষের সুলভ ভরসাবাদ এক নয়। তিনি জানতেন,—জীবনের প্রতি মুহূর্তে জানতেন,—যে চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। তবু ঈশ্বর-পুত্র হয়েও অন্তরে অন্তরে তিনি মানুষ,—তাই আশংকাকেও তিনি গোপন করতে চাননি। চরম যন্ত্রণার মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর নির্ভীক আত্মাও শিহরিত হোলো,—পরম-পিতার উদ্দেশ্যে আর্ত নিবেদন ধ্বনিত হোলো,—'হে পিতঃ, তোমার দ্বারা সকলই সম্ভব,—এ পানপাত্র সরাও তুমি আমার মুখের সামনে থেকে।'

আবার বেদনার অবসানে শক্তি যখন ফিবে এল তখন তিনি মহান কর্তৃত্বের সঙ্গে পিটারকে বললেন,—'খাপের মধ্যে পুবে ফেলো তোমার তরবারি। যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, তাব পানীয় আমি পান করব না?'

এক নিশ্বাসে শেষ চুমুক পর্যন্ত পান করলেন যীশু।

ধর্মগ্রন্থে শ্বেত পাথরের পাত্র ভাঙাব একটি কাহিনী আছে। তখন নিস্তার সপ্তাহেব প্রায় অবসান, যীশুব চবম আত্মদানেব ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সেই আসন্ন প্রহরে যীশুর মনোভাবের পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে মেলে।

মহার্ঘ গন্ধদ্রব্যপূর্ণ শ্বেত পাথরের রুদ্ধ পাত্রটি চূর্ণ কবে এক নারী যীশুর মস্তকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়ে দিল। পাত্রটি চূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে যীশুর মনে হোলো তাঁরও মৃত্যু বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। সুগন্ধি আসব লাভ করতে হলে যেমন নিরুদ্ধ প্রস্তর-পাত্রকে চূর্ণ করতে হয়, তেমনি তাঁহার মরদেহকেও এবার চূর্ণ করতে হবে। তবে না তাঁর অন্তব-সুরভি ব্যপ্ত হবে দিকে দিকে! ভক্ত নারীব এই অবদান লক্ষ্য করে যীশু বললেন,—'আহা, এ আমার প্রতি অতি সৎকার্য করেছে, আমার দেহে এই সুগন্ধি তৈল ঢেলে আমার সমাধির উপযোগী কাজ করেছে!'

ভক্তরা বুঝতে পারল না, বিরক্ত হোলো, অস্ফুটস্বরে অনুযোগ করল,—এ যে অপব্যয়! এই অপব্যয় কথাটি যীশুর মর্মে গিয়ে বিঁধল। না, না, অপব্যয় নয়। তাঁর দ্বিধাহীন আত্মদান,—তাও কি অপব্যয়? নারী তার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাটি বুঝি ঠিক বুঝেছে! স্পর্শ-কাতর অন্তরের কোমল অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছে তাঁরই অন্তরের বেদনা! কিছু না ভেবে মুষ্টিমাত্র সঞ্চয় না করে উদার হাতে সব কিছু বিলিয়ে দেওয়া,—এ তো অপব্যয় নয়! ঈশ্বর-পুত্র যীশু দান করেছেন তাঁর জীবন, বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সত্তা, ক্রুসের কাষ্ঠে চূর্ণ করেছেন তাঁর আপন দেহ—পুরুষের বলিষ্ঠতায় আর নারীর অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে!

ঈশ্বরও কিছুই রাখেন না। তাঁর উদার কল্যাণ-আশীর্বাদ তাঁর অসীম করুণা তিনি আত্মহারা আনন্দে মনুষ্যসমাজে বিতরণ করেন। এই সত্য যীশু পার্থিব নরনারীর প্রাণে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যীশু যেন কবি, যীশু যেন শিল্পী,—সমগ্র জীবন ধরে শিল্পধর্মী প্রেরণায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, অবিশ্বাসীর প্রস্তর-কঠিন অনমনীয় মনকে ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শলাভের জন্য নমনীয় করেছেন! যে মন অনড় নিষ্প্রাণ, সেই মনকে তিনি আপন প্রশ্বাস-ফুৎকারে সঞ্জীবিত করেছেন, সেই মনকে তিনি আপন শিল্পাঙ্গুলিস্পর্শে গঠন করেছেন,—ভাস্কর যেমন অবয়বহীন জড়পিণ্ড থেকে রূপসৃষ্টি করে। কবি যেমন কাব্য রচনা করে, শিল্পী যেমন বীণায় তোলে সুরের লহরী,—তেমনি তিনি রচনা করেছেন মহান্ জীবনকাব্য,—তেমনি মানবভাগ্য জুড়ে তিনি বহিয়েছেন অনির্বচনীয় সুর-মন্দাকিনী। যীশুর এই সৃষ্টিলীলা আমরা বাস্তব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করিনে, অন্তর দিয়ে অনুভব করি। মানবভাগ্যে খৃষ্টজন্মের সুফল দেখে বিস্মিত হই।

ঈশ্বরের কল্যাণ-স্পর্শ কেবল মাত্র কোমল নয়,—অন্যায়ের মুখোমুখি এই স্পর্শ বজ্রকঠিন। যীশুর প্রেম শিথিল ভাবালুতা নয়। এ প্রেম

কখনো বা ব্যাথার মতো, যন্ত্রণার মতো! মধ্য-আফ্রিকায় অ্যালবার্ট স্কুইটজারকে বহু সময় তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত দিয়ে শল্যচিকিৎসা করতে হয়। সেই আঘাত কেবল মাত্র ক্ষত সৃষ্টি করে না, ক্ষতের গভীরে প্রবেশ করে ব্যাধির মূলকে নির্মূল করে ক্ষতকে সারিয়ে তোলে। ঈশ্বরের করুণাও একই প্রকারের। এই করুণা বেদনাকে ধ্বংস করবার জন্যেই বেদনা হানে। এই ক্ষত পরম বন্ধুর বিশ্বস্ত ক্ষত।

ঈশ্বরের এই কঠোব প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন সাধু পল। হিব্রুগণের প্রতি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—'প্রভু যাকে প্রেম কবেন, তাকেই তিনি শাসন কবেন,—যে পুত্রকে তিনি গ্রহণ করেন, তাকেই তিনি প্রহার করেন। ঈশ্বরের শাসনকে যদি সহ্য করো, তাহলেই হবে ঈশ্বরের পুত্রোপম। পিতা যাকে শাসন করেন না, এমন পুত্র কোথায় ?'

যীশুও বলেছেন,—'যে সমস্ত তরু তাঁব পিতা রোপণ করেননি, সেই সব তরুকে নির্মূল করতে হবে।'

এই সংসাবে অন্যায় ও পাপেব উৎস চেতনাব গভীব অন্ধকারে, পাপের বহস্যকে যুক্তিতর্কেব সোজা কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই অতি আশ্চর্য উপমাব সাহায্যে প্রভু খৃষ্ট এই পাপের অবসানকে প্রকাশ করেছেন। গর্ভিনী নাবীব প্রসব-যন্ত্রণার আনন্দময় অবসানকে তিনি চিত্রিত কবেছেন, শুষ্ক তৃণকে পবিত্যাগ কবে হেমন্ত-ক্ষেত্রের সোনার ফসল সংগ্রহের ছবি তিনি এঁকেছেন, বীজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফলের জন্মের গান তিনি গেয়েছেন।

যীশুর প্রাণ ছিল কবিব প্রাণ, তাঁব প্রকৃতিতে ছিল কবির অনুভূতি। নিজেরই অজ্ঞাতে কখনো তাঁর মন হোতো হর্ষোল্লাসে উৎফুল্ল, কখনো বা হতাশ বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ। এইখানেই তাঁর মানবত্বের পরিচয়,— মানুষেরই মতো দুঃখ-সুখে আপ্লুত ছিল তাঁর হৃদয়।

তাঁর সৃজনী-প্রতিভা ছিল বিশাল। নির্ভীক দ্রুততার সঙ্গে যে আকাশচুম্বী সৃষ্টি তিনি করে গেছেন, একমাত্র মহাপ্রতিভাধর শিল্পীর দুর্দমনীয় আবেগেই তা সম্ভব। যে আশ্চর্য দূরদৃষ্টির ফলে তিনি মানব-ভাগ্যকে প্রদীপ্ত ভবিষ্যতের পথে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন, সেই দৃষ্টি জ্বলন্ত শিখার মতো। সেই দৃষ্টিশিখার দিকে চোখ রেখে আমাদের ইন্দ্রিয় বুঝি বিস্ময়াঘাতে অনড় হয়ে যায়। কিন্তু সেই অনড়ত্বে আবার প্রাণ সঞ্চার করেন তিনি। তিনি দেখেন, তিনি কাজ করেন, মানব-ঐতিহ্যকে তিনি গঠন করেন নূতন রূপে।

শিষ্যবৃন্দের প্রত্যাবর্তনে তাদের সঙ্গে জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে যীশু বললেন,—'আকাশ থেকে বজ্র যেমন খসে পড়ে, তেমনি আমি শয়তানকে খসে পড়তে দেখেছি।' ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,—'পৃথিবী ও স্বর্গের একেশ্বর হে পরম-পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি,—কেন না যারা প্রবীণ, যারা তথাকথিত জ্ঞানী, তাদের কাছে না প্রকাশ করে শিশুর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছ তুমি।'

আবার এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন মুহূর্তে তাঁর মনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাঁর কটি মাত্র কথায়,—'আমার মনে দুঃখের শেষ নেই, মৃত্যুতে যে দুঃখের সমাপ্তি।'

কখনো হতাশা, কখনো আশা, কখনো আনন্দ, কখনো বিষণ্ণতা—মনের এই বিচিত্র আলো-অন্ধকারকে যীশু আমাদের কাছ থেকে ঢেকে রাখেন না। শিশুর মতো সরল তার হৃদয়। যখনই যা তিনি অনুভব করেন প্রকাশ করেন অকপটে। তবে মনের দাসত্ব তিনি করেন না। সঙ্গীতশিল্পী যেমন প্রতিটি ঝংকারকে আয়ত্ত রাখে, তেমনি আপন মনের প্রতিটি অনুভূতি তাঁর আয়ত্তাধীন। নিপুণ গীতকারের মতো ছোট-বড়ো বাদী-সম্বাদী প্রত্যেকটি স্বর ব্যবহার করে তিনি মহাসঙ্গীত সৃজন করেন। জীবনের সর্বপ্রকার অনুভূতি দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ করেছেন নিজের জীবন,—এমন কি যখন ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন, তখনো

কোনো বেদনা-নিবারক ঔষধ তিনি চাননি। তিনি ঘোষণা করেছেন,—'মানুষ যাতে জীবন লাভ করে, বিচিত্রতর বিস্তৃততর জীবনের আস্বাদ যাতে মানুষ পায়, সেই জন্যই আমি আবির্ভূত হয়েছি !'

যীশুর চরিত্রে এক অপূর্ব ভাবসাম্য। কখনো আনন্দ কখনো বেদনা—কিন্তু এই দুই অনুভূতির মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলেছে আত্মা। জীবনের যা গভীর ঐশ্বর্য,—তার আড়ম্বর নেই,—তা সরল তা মৌলিক। এই গভীর ঐশ্বর্যের কথা যীশু তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন,—তাই তাঁব বাণী চিরকাল মানুষের অন্তরে জাগরূক থাকবে। সেই জন্য তাঁর বাণী ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েও সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তরে স্পর্শ করে। মানবহৃদয় তার মহার্ঘতম মুহূর্তে যে বাণীর প্রত্যাশা করে,—সে বাণী যীশুখৃষ্টের বাণী।

শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ খৃষ্টবাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই আমাকে বলতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বৃদ্ধ দার্শনিক ও ঋষি, - যৌবনকালে তিনিও ছিলেন সার্থক কবি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন,—তাঁর পরিচিত আমরা সকলেই তাঁকে বড়দাদা বলে ডাকতাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ছিল তাঁর বিশিষ্ট অন্তর-ভূষণ। তাঁর মন ছিল শিশুর মতো। তাঁর দার্শনিক জ্ঞান ছিল গভীর, বিদ্যা ছিল অসীম। বৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় বসে থাকতেন,—পাখি আর কাঠবিড়ালিরা নির্ভয়ে তাঁর আশেপাশে খেলা করত। এই ভাবে নিস্তব্ধ ধ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মরজীবনকে পরিসমাপ্তির পথে নিয়ে চলেছিলেন। এই শেষ জীবনে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে নীরব সাধনায় তিনি কালাতিপাত করতেন,—এই সাধনায় তাঁর আত্মা দুর্লভ ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করত।

প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সারল্য ও বিনয় ছিল তাঁর অন্তর-ভূষণ। যখন যে কথা তিনি বলতেন সে কথায় সত্য উদ্ভাসিত হোতো। প্রতিদিন সূর্যাস্তকালে সারাদিনের মতো সামান্য আহার সাঙ্গ করে তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকতেন। সারাদিন যতো প্রকার চিন্তা তিনি করতেন দিনান্তে সেই সব চিন্তাকে একত্রে গ্রথিত করে আমার হাতে তুলে দিতে তিনি ভালোবাসতেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি কেবলই 'সারমন অন দি মাউন্ট' পাঠ করতেন ও এই খৃষ্টোপদেশের সারাৎসার নিয়ে আলোচনা করতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন,—যীশুর এই উপদেশাবলী আমার খাদ্য আমার পানীয়। যীশুর বাক্য এতো সরল যে শিশুও তা বুঝতে পারে, কিন্তু আবার অন্তর্নিহিত অর্থে সে বাক্য কতো গভীর! উপনিষদের মতো পৃথিবীর মুষ্টিমেয় মহাসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত যীশুর এই বাক্য। কতো বড় স্পর্দ্ধাভরে যীশু বলেছিলেন,—আমার বাক্য কখনো মুছে যাবে না। কতো বড়ো সত্য কথা তিনি বলেছিলেন। সত্যই অবিনশ্বর তাঁর বাক্য। দিনের পর দিন তাঁর বাণী নিয়ে আমি চিন্তা করি। গভীর রাত্রের নিদ্রাহীন প্রহরে তাঁর বাণী আমার অন্তরে এসে বাজে। তাঁর বাণীর ব্যাখার জন্যে কোনো টীকার প্রয়োজন নেই,—অথচ তার অন্তর্গূঢ় অর্থেরও কোনো সমাপ্তি নেই। যীশুর বাণীতে সেই সত্যের স্ফুলিঙ্গ আছে যা মানুষকে চিরদিন পথ দেখায়,—মৃত্যুর অন্ধকারকেও অপনোদন করে।

যীশুর যে বাণীটি দ্বিজেন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তা হোলো এই,—

'অন্তর যাদের পবিত্র তারা ভাগ্যবান,—কেননা ঈশ্বরের দর্শনলাভ তারা করবে।'

এই বাণীর পরম সম্পূর্ণতা তাঁকে চরম তৃপ্তি দিত,—তিনি বারে বারে এই বাণী উচ্চারণ করতেন। আর একটি বাণীও তাঁর অনুরূপ প্রিয় ছিল,—'ঈশ্বরের রাজ্য তোমারই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত।' এই বাক্যটি

যখনই তিনি আমার সামনে উচ্চারণ করতেন, তাঁর শ্রদ্ধা-বিস্ময়ঘন কণ্ঠে এই বাক্য যেন অচিন্ত্যপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেত। ঈশ্বরের রাজ্য কোনো বাহ্যিক বাস্তব রাজ্য নয়, মানুষের মনোরাজ্যই সেই রাজ্য,—প্রতি মানুষের হৃদয়কন্দরেই ঈশ্বরের সিংহাসন—এই সব কথা বারে বারে বলতে গভীর আনন্দ লাভ করতেন বড়দাদা।

গভীর দার্শনিক উপলব্ধি ও নিবিড় কবিচিত্তেব সহযোগে দ্বিজেন্দ্রনাথ খৃষ্টবাণীর মধ্যে নূতন অর্থ ও নূতন ইঙ্গিতের সন্ধান পেতেন। তাঁর ভাষ্য ও আমার ধারণার সঙ্গে কখনো কখনো মিলত না;—কিন্তু তিনি তা নিয়ে তর্ক করতেন না, শান্তভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলতেন যে যীশুর মতো মহাপ্রভুর বাণীব গভীরত্ব অপরিসীম। কোনো মানুষ এক নিশ্বাসে ঘোষণা করতে পারে না,—তাঁর বাক্য আমি সব বুঝে নিয়েছি। যীশুর বাণী অমৃত-নির্ঝরিণী—পিয়াসী মানব যুগে যুগে সে নির্ঝরিণীর পানীয় গ্রহণ করে। প্রতি যুগের মানুষ প্রতি বার নূতন কবে এই সত্য-উৎসের সম্মুখে অঞ্জলি পাতে,—এবং মানুষের পবম প্রয়োজনের তৃষা যতোদিন না নিবৃত্ত হবে ততোদিন যুগে যুগে মানুষ এই মন্দাকিনীর তীর্থসলিলে পূত হবে।

যীশুব জীবনে ক্রুসের আঘাত পড়েছিল যখন তিনি যৌবনের শীর্ষদেশে। যৌবনাবস্থাতেই তিনি আত্মদান করেছিলেন। মধ্য বয়সের দীর্ঘ ছায়া তাঁর জীবনপথে পড়েনি। তাই তাঁর প্রতি বাক্যে যৌবনের স্পর্শ। এইখানেই ক্রুসের সবচেয়ে বড়ো বেদনা,—এই ক্রুস যৌবনকে হনন করেছিল, মানবপ্রেমিক তরুণ কবিকে হনন করেছিল। দৈববক্তা বলেছিলেন,—'লক্ষ্য করো আমার বেদনার চেয়ে গাঢ়তর বেদনা আব কোথাও আছে কি না!' মানব-ইতিহাসের পরমতম বেদনা নবীন যীশুর বেদনা।

যীশুর আনন্দ-বেদনা বিকসিত যৌবনের প্রখর ইন্দ্রিয়োপলব্ধির সংবেদনা। এই জন্যেই এতো আনন্দ তিনি বিচ্ছুরিত করেছিলেন, এতো বেদনা তিনি সহ্য করেছিলেন। বৃদ্ধ বৈরাগ্যসাধকের মতো তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ রাখেননি,—পরিত্যাগ করেননি পান-ভোজনের পরিতৃপ্তি। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সুষমার প্রতি তিনি পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন।

তীরের মতো তীক্ষ্ণ ছিল যীশুর বাস্তব বিচারবুদ্ধি,—উদাসীনতা দিয়ে এই বুদ্ধিকে তিনি আবিল করেননি। মানসিক স্বাধীনতার অমর ঘোষণা তিনি করেছেন, বলেছেন,—'সত্যই তোমাকে মুক্তি দেবে, মিথ্যাই বন্ধন।'

যীশু সেই নিত্যকালের নির্ভীক যৌবনের প্রতিভূ,—যে যৌবন অকুতোভয় আত্মবিশ্বাসে অকল্পনীয় বাধার সম্মুখীন হয় এবং আত্মার অপরাজেয় বীর্যে সব বাধা জয় করে। অন্যান্য বিশ্ব-ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক,—নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরাও মহান পুরুষ,—কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথিবীতে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেছিলেন এবং দীর্ঘ ধর্মপ্রচারের অবসানে বৃদ্ধবয়সে দেহরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যীশুর চরিত্র এক অনতিক্রমণীয় ঊর্ধ্বতায় প্রতিষ্ঠিত,—চিরন্তর যৌবনশীর্ষের সিংহাসনে তাঁর আসন।

প্রতি যুগের সাধারণ মানুষ খৃষ্টচরিত্রের এই উত্তুঙ্গ উচ্চতাকে নিজের সাধারণ খর্বতার স্তরে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে,—তাঁর বাণীর নির্ভীক মহত্ত্বকে শৃংখলিত করতে চেয়েছে আপন সন্ত্রস্ত অভিজ্ঞতার কারাগারে। কিন্তু খৃষ্টকে বাঁধা যায় না। মানুষের বন্ধনমোচন তিনি করেন,—চিত্তকন্দরের নিষুপ্ত প্রেরণাকে তিনি জাগ্রত করেন। বারে বারে যুগে যুগে তিনি ঘোষণা করেন,—'বিশ্বাসের অমোঘ

শক্তিবলে অসম্ভবকে সম্ভব করো, বিশ্বাসের অমিত আকর্ষণে স্থাণু পর্বতকে করো চলমান।'

'প্রথম স্বর্গ ও প্রথমে মর্তের অবসানের পর এক নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী আমার চোখে প্রতিভাত হোলো।'—খৃষ্টবাণীর এই সঙ্গীত নব নব যুগের মানুষকে নব নব কর্মের অভিযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছে,—অনন্ত সুরনির্ঝরে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর বুকে জাগিয়েছে চলিষ্ণুতার ছন্দিত স্পন্দন।

যীশুখৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ধর্মপ্রবর্তক,—এই তাঁর আশ্চর্যতম বলিষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে আমি ইউরোপে থাকতে ততো বুঝিনি যতো বুঝেছি প্রাচ্যদেশে এসে। মানবসমাজে বুদ্ধের প্রসন্ন প্রশান্তিরও প্রয়োজন আছে—এই প্রয়োজন জ্ঞানবৃদ্ধের। কিন্তু যীশুর প্রেমোন্মাদ আহ্বান প্রমত্ত যৌবনের ভাষা। এই ভাষা ঝটিকার মতো বেগবান, বিদ্যুতের মতো প্রখর,—মানুষকে চলিষ্ণুতায় অনুপ্রাণিত করতে হলে এই আহ্বানেরই প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায়েব প্রতি বিক্ষুব্ধ ঘৃণারও স্থান আছে,—যে ঘৃণা যৌবনের বলিষ্ঠতা থেকেই সম্ভব। আত্মম্ভরী ফরীসীদের যীশু যে ভাষায় ভর্ৎসনা কবেছিলেন সে ভাষা বিক্ষুব্ধ ঝটিকার মতো ভয়ংকর, সে বিচারে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এই ভয়ংকর ভর্ৎসনার শেষে যীশু আবার বুকফাটা বিলাপ করেছেন, ক্রোধ তখন অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলেব সঙ্গে তিনি বলেছেন,- –

'হা জেরুসালেম! ঈশ্বর যে সব সত্যদ্রষ্টাদের তোমার কাছে প্রেরণ করেন তাদের তুমি পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো। কুক্কুটী যেমন তার শাবকদের পক্ষের নিচে একত্র করে, তেমনি আমি কতোবার তোমার সন্তানদের একত্র করবাব ইচ্ছা করেছি। কিন্তু তুমি তাতে

সম্মত হলে না। তাই দেখ, আজ উচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত মরুময় তোমার গৃহ!'

যীশুর মানসিক উত্তেজনা ক্রোধ দিয়ে আরম্ভ,—করুণায় তার অবসান। মানবাত্মার প্রতি তাঁর মহার্ঘ মঙ্গলময় দান প্রথমে ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুতের মতো আঘাত করে, পরে তা শান্ত বর্ষাধারার মতো করুণাস্নানে প্লাবিত করে। তখন পরিচ্ছন্ন হয় ধরিত্রী, মেঘবিহীন নীলাকাশ ঝলকিত হয় সূর্যের উজ্জ্বল দাক্ষিণ্যে। হৃদয়ের গভীরতব কন্দরকে পবিত্র করার জন্য দুঃখের কশাঘাতের প্রয়োজন,—সেই সঙ্গে প্রয়োজন আনন্দ ও আশ্বাসের ব্যথা-প্রলেপ।

খৃষ্টচরিত্রের বিশিষ্ট গুণ সাহস, বীরত্ব, অকুতোভয়তা। এই গুণ মানব-অন্তরের গভীর গুহাদ্বারে আঘাত করে, আবার অন্তর-আকাংক্ষাকে অসীম উচ্চতার প্রতি আকর্ষণ করে। খৃষ্টচরিত্রের এই মৌলিক মহিমা ধর্মগ্রন্থের মূল সূত্র। খৃষ্টমহিমা এক সর্বজয়ী বিপ্লবের দুবন্ত প্লাবন বা প্রাচীন জীর্ণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যাব মতো তা পুরাতনকে বিধ্বস্ত করে। ঈশ্বরের নবীন রাজ্যের অমৃত সুধাধারাকে প্রাচীন পাত্রে আবদ্ধ রাখা যায় না। সেই পাত্র চর্ম-নিমিতই হোক আর প্রস্তর-নির্মিতই হোক, বিস্ফোবণের মতো চূর্ণ হয় তার আবরণ।

খৃষ্টের চিত্র অত্যন্ত বীভৎস বিকৃতভাবে মাঝে মাঝে চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্র অনুসারে তিনি রক্ষণশীল নীতিবাদী, তিনি সাবধানী ধর্মপরায়ণ,—অসহ্য রকমের শান্তসন্ত্রস্ত। এই চিত্র মিথ্যা,—এই চিত্র ইতিহাসকে বিকৃত করে। এইরূপ বৈশিষ্ট্যহীন দুর্বল চরিত্র কখনো পৃথিবীর অন্যায়ের শক্তিকে পরাভূত করতে পারত না, যুগে যুগে যৌবনের উদয়কে উদাত্ত আহ্বানে জাগ্রত করতে পারত না।

নবজন্মের বীজকে সংস্কারের খোলস সর্বত্র বন্দী রাখতে চেষ্টা করে। সেই আচ্ছাদনকে বিদীর্ণ করে জীবন নবারুণের আলোকে চোখ মেলে। প্রাচীনের জীর্ণ আবরণ সর্বদাই চেষ্টা করে মানুষের অভিযাত্রী আত্মাকে অনড়তার কারাগারে বন্দী করে রাখতে। কিন্তু প্রতি যুগে নূতন করে যীশু এসে উপস্থিত হন। তিনি আসেন সংস্কারের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দিতে।

দক্ষিণ আফ্রিকা

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবাসীদের অন্যতম পরম আস্থাভাজন নেতা ছিলেন গোখেল। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর কাছ থেকে তারযোগে আমি এক জরুরি নির্দেশ পেলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমদাসত্ব-প্রথার কবলে অসহনীয় অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছে। এই প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী। এদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করতে হবে,—এই হোলো গোখেলের নির্দেশ।

নাটালের বিভিন্ন বাগিচায় কাজ করবার জন্যে ১৮৬১ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক চালান করা হোতো চুক্তিপ্রথার মাধ্যমে। দিনে দিনে এই প্রথা অতি বীভৎস রূপ ধারণ করেছিল,—জমে উঠেছিল নানা অন্যায়ের দুরপনেয় কলংক। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্যে পেশাদার আড়কাটি নিযুক্ত করা হোতো,—এরা মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকের মাথা-পিছু দাম পেত। পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোক চালানের পারিশ্রমিক ছিল বেশি। আড়কাটিরা নির্বিচারে ছলবলের আশ্রয় নিত। হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিককে তারা চুক্তিপ্রথায় সংগ্রহ করে নাটালে চালান দিয়েছিল। ফলে নাটালে ইউরোপীয়ের চেয়ে ভারতীয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ভারত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল তাতে সর্ত ছিল এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা নাটালে পাঁচ বছরের জন্য কাজ করবে। পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর ভারতীয়

শ্রমিক স্বাধীনভাবে নাটালে বসবাস করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু এই চুক্তিকে বানচাল করবার উপায় উদ্ভাবনে দেরি হয়নি। নাটাল গভর্ণমেণ্ট আইন করল যে পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিককে হয় তিন পাউণ্ড কর দিতে হবে না হয় আবার আর এক পাঁচ বছরের জন্যে শ্রমচুক্তি করতে হবে। যে করও দেবে না বা নূতন করে শ্রমদাসত্ব মেনেও নেবে না তাকে নাটাল থেকে বিতাড়িত করা হবে।

নাটাল সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অতি সরল। ভারতীয়েরা হয় চিরকাল বাগিচার শ্রমদাস হয়ে থাকবে না হয় তাদের রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হবে। মাথা-পিছু মুক্তিকর স্ত্রী-পুরুষ ও এমন কি পনেরো বছরের উপরের বালকবালিকাকেও দিতে হবে। এমনি মহার্ঘ মাশুল দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকের ক-জনই বা পারবে?

এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-প্রথা দাসত্ব-প্রথার নামান্তর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার ডবলু ডবলু হাণ্টার বলেছেন যে এই প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে সীমারেখা টানা দুষ্কর। বাস্তবিক অবস্থা তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করার পর আমিও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলাম যে হাণ্টারের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। ভারতীয় শ্রমিকরা নিজের পছন্দমত মালিক নির্বাচন করতে তো পারতই না, যদি বা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাগিচা ত্যাগ করতে চেষ্টা করত, তাহলে ফৌজদারী অপরাধে শাস্তি পেত।

সরকারী পর্যবেক্ষণের একটা তথাকথিত ব্যবস্থা যে ছিল না তা অবশ্য নয়। কিন্তু তাতে মালিকের নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্রও লাঘব হোতো না। প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস দাসের মনে মোটেও ছিল না। এই প্রথার সব চাইতে বীভৎস রূপ ছিল এই যে, প্রতি একশো জন পুরুষ শ্রমিকের অনুপাতে চল্লিশ জন করে নারী শ্রমিক সংগ্রহ করা হোতো। বিবাহিত দম্পতি অতি অল্পই ভারতবর্ষ থেকে আসত। অতএব পুরুষ ও নারী শ্রমিকের সংখ্যার এই বিপজ্জনক

তারতম্যের ফলে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে দাসত্ব-প্রথা রদ হয়। দাসত্ব-প্রথার পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার উদ্ভব হয় এবং এই প্রথা অনুসারে মরিশাস, ট্রিনিডাড, জামাইকা, গ্রেনাডা, বৃটিশ গায়না প্রভৃতি উপনিবেশের ইক্ষুবাগিচায় দলে দলে ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হয়। প্রাক্তন দাসত্ব-প্রথার অধিকাংশ অনাচার এই নূতন প্রথাতেও ফুটে উঠতে থাকে,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন প্রথার কলংক পূর্বতন প্রথার কলংককে ছাড়িয়ে যায়। মালিক যেখানে ভালো হোতো, সেখানে ভারতীয় শ্রমিকরাও ভালো ব্যবহাব পেত। কিন্তু মালিক যেখানে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা লাগামে-বাঁধা জন্তুর মতো। এমনি অত্যাচার ও নিপীড়নেব ফলে কতো হতভাগ্য শ্রমিক যে আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করত তার ইয়ত্তা নেই। বাগিচা-জীবনেব দুর্নীতি দুর্ভাগ্যকে আরো গভীরতর করে তুলত,—কখনো বা পৌছতো নারীহত্যা ও পুরুষেব আত্মহত্যার ভয়ংকর পরিণতিতে। এই সমস্ত হত্যালীলায় আখ-কাটা ধারালো ছুরি সাধাবণত ব্যবহৃত হোতো। সরকাবী তথ্য থেকেই জানা যায় যে, বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথাব বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় শ্রমিককে বাগিচাব দাসত্বে শৃংখলিত রাখাব জন্যে নাটাল সরকার যে তিন পাউণ্ড মুক্তিকর প্রবর্তন কবেছিল এই কর অন্যায় ও মানবতাবিরোধী বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই করের প্রধান সমর্থক ছিল ইউরোপীয়ানবা। ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও জেনারেল বোথা বা জেনারেল স্মাট্স, উভয়েব কেউই ইউরোপীয়ানদের চটিয়ে এই কর রদ করবাব নির্দেশ দিতে পারেন নি। মনে মনে তাঁদের হয়তো সদিচ্ছা ছিল,—গোখেল যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান

তখন তাঁরা গোখেলকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন,—কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা রাখতে পারেন নি।

এই অন্যায় করকে রদ করবার জন্যে সমস্ত প্রকার আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হোলো তখন মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীরা অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। উত্তর নাটালের কয়লা খনি অঞ্চল থেকে একদল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহের বাহিনী গঠন করলেন। ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই বাহিনী নিয়ে তিনি ট্রান্সভাল যাত্রা করলেন। দু-হাজারের অধিক ভারতীয় পুরুষ নারী ও শিশু গান্ধীজীর নেতৃত্ব বরণ করে নিল, তাঁর পিছু পিছু ড্রাকেন্‌সবার্গ পর্বতমালা পাব হয়ে ট্রান্সভাল অভিমুখে যাত্রা করল। আরো হাজার হাজার ভারতীয় পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। কয়লা খনি পবিত্যাগ করা এবং ট্রান্সভালে প্রবেশ কবা দুই কাজই বে-আইনি,—উভয় কারণেই সশ্রম কাবাদণ্ডেব কঠোব শাস্তি। প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও তাদেব আত্মীয় বন্ধুগণ এই শাস্তিব কথা জানত—তবু তারা ভয় পেল না। দুর্গম পথযাত্রায় কষ্টেব সীমা নেই, কিন্তু গান্ধীজীর অনুবর্তীগণের একজনও পিছন ফিবল না।

শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সঙ্গীসহ মহাত্মা গান্ধী কারাববণ করলেন। আন্দোলনেব প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেউ বা জেলে কেউ বা হাজতে আবদ্ধ হলেন। নাটাল থেকে আরো ভারতীয় শ্রমিক বাগিচা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে অগ্রসব হলে তাদের উপর শারীবিক অত্যাচার শুরু হোলো,—গুলী চলল নিবস্ত্র অভিযাত্রীদের উপর। ভারতবর্ষে যখন এই সব সংবাদ পৌছলো, তখন উত্তেজনা চবমে উঠল। প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন এই সংকটজনক পরিস্থিতি,—গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা যখন প্রত্যেকে কারারুদ্ধ,—তখন গোখেল আমাকে তারযোগে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে সে দেশে যাবার জন্যে। স্বদেশে আমার মা তখন অন্তিম রোগশয্যায়,—আমি ইতিমধ্যে তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেশে রওনা হচ্ছি। আমার মার জীবনে স্বার্থপরতার লেশ ছিল না। এবার তিনি তাঁর শেষ স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দিলেন, আমাকে লিখলেন,—তাঁর কাছে না গিয়ে নাটালেই যেন আমি যাই, সেখানে তাঁব ভাগ্যহত ভারতীয় ভগিনীদের পবম প্রয়োজনেব ক্ষণে তাদেব যেন আমি সেবা করি। মার সঙ্গে আর আমাব দেখা হোলো না, আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছবার কিছুদিন পরেই তিনি চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ডাক্তার স্যামুয়েল পিয়ার্সনের পুত্র উইলি পিয়ার্সন নাটাল যাত্রায় আমার সাথী হোলো। উইলির মা কোয়েকার ছিলেন। দিল্লীতে উইলি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার আশ্চর্য ব্যবহারে সে আমাকে একেবারে চমৎকৃত কবে দিল। তাড়াহুড়ো করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি,—কেন না দেবি কববার সময় নেই, সেদিন মধ্যরাত্রেই দিল্লী থেকে যাত্রা করতে হবে,—নইলে জাহাজ পাব না। উইলি আমার কাছে এসে বললে,—তোমার যাওয়ার আগে একটি উপহার তোমাকে দিতে চাই। আমি প্রশ্ন করলাম,—উপহার? বেশ তো, কী উপহার?

উইলি বললে,—এই যে, উপহার তোমার সামনেই উপস্থিত—আমি।

তারপর তার সে কী উল্লাসভরা হাসি।

তার এই কৌতুকভরা আত্ম-উপহার তার উচ্ছল চরিত্র-মাধুর্যেরই প্রতীক। তার মতো অকপট বন্ধু ও বিশ্বস্ত অনুচর আমি ইতিপূর্বে পাইনি। নাটালে পৌছনো মাত্র সে মুহূর্তে সেখানকার ভারতীয়দের

অন্তর জয় করে নিয়েছিল। তীরের আশ্রয় পরিত্যাগ করে নানা সমুদ্রযাত্রা আমার আরম্ভ হোলো,—এই সব যাত্রায় উইলি ছিল আমার প্রধান সহায়। আমার জীবনের গভীরতম আঘাত আমি পাই যখন ১৯২৪ সালে ইটালিতে এক চলন্ত ট্রেণ থেকে পড়ে উইলি মারা যায়। তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যই এই শোক অসহনীয় হয়েছিল।

কলম্বো থেকে ডারবান যাত্রার পথে অধিকাংশ দিন আমাদের জাহাজ প্রবল ঝটিকার পিছনে পিছনে চলল। ফলে ডারবান পৌঁছতে আমাদের পাঁচদিন দেরি হয়ে গেল। তীরে পৌঁছতে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, জাহাজঘাটে মহাত্মা গান্ধী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জেনারেল স্মাট্স মীমাংসা চান, তাই তিনি বিনা সর্তে গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়েছেন। বুঝলাম, অসমর্থনীয় পোল-ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর আপত্তিকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নিগ্রহের মূল রহস্য কী, তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র দেরি হোলো না। মূল কারণ জাতিভেদ আর বর্ণবিদ্বেষ। ভারতীয়রা কৃষ্ণকায় জাতি ;—একমাত্র বাগিচার মালিকরা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য সমস্ত ইউরোপীয়ানরা চাইত ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দূর করে দিতে। ভারতীয় শ্রমিকদের কেন যে আমদানী করা হয়েছিল, এই ছিল তাদের মহাদুঃখ। আফ্রিকার অন্যান্য কৃষ্ণকায় জাতিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হীনতার মধ্যে জীবন কাটাতে হোতো,—ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্য হোলো ভারতীয়েরাও যতোদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবে, ততোদিন তাদেরও বর্ণমালিন্যের হীনতা মেনে নিয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকতে হবে।

দিল্লীতে অথবা স্টোক্‌সের সঙ্গে শিমলা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম তখনই খৃষ্টান সম্প্রদায়েব মধ্যে জাত্যাভিমান ও বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্রয় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। জাতির বাধা আর বর্ণের বাধা মানুষ আর মানুষের মধ্যে প্রাচীর তুলবে,—আমি ভাবতাম প্রকৃত খৃষ্টান হয়ে এই বাধাকে আমি মেনে নেব কেমন করে? এই বাধার ফলে পৃথিবীতে এমনি এক জাতিভেদ-প্রথাব সৃষ্টি হয়েছে যা আমাব প্রভু যীশুখৃষ্ট চাননি। তিনি বলেছিলেন,—মানুষে মানুষে ভাই ভাই আব সর্বমানবের পরম-পিতা ঈশ্বব। এই জাতিভেদেব ফলে খৃষ্টীয় বিশ্বসমাজ টুকবো টুকবো হয়ে যাবে,—ধর্মেব ঐক্যকে খান খান কবে দেবে জাত্যাভিমানের অস্ত্র। সর্বমানবেব ভ্রাতৃত্বেব মৌলিক দাবীব জন্য ক্রুসে আত্মবিসর্জন কবেছিলেন খৃষ্ট। কিন্তু খৃষ্টান হয়েও দুই জাতি পাশাপাশি বসে উপাসনা কবতে পাবে না। আমি ভাবতাম—এ কী আমবা কবছি, কোন সর্বনাশা পথে আমবা চলেছি? খৃষ্টান হযে খৃষ্টেব মুখে কলংক লেপন কবে নূতন কবে কি আবাব তাঁকে ক্রুস-বিদ্ধ করব?

ধর্মগ্রন্থ পাঠ কবে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি কবেছিলাম যে ইহুদীদেব জাতীয় কুপমণ্ডুকতা যখন প্রাথমিক খৃষ্টীয় সমাজকে দ্বিখণ্ডিত কবতে উদ্যত হয়েছিল, তখন এই বিপদকে প্রতিহত কববাব জন্যে খৃষ্টশিষ্য পল এমন কি সাধু পিটাবেবও মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী পলেব পত্রাবলীব ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে।

নিউ টেস্টামেণ্টেব অন্যতম প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা জাতিভেদকে পবিহার কবার শিক্ষা। জাতিমিলনেব বাণী খৃষ্টেব দ্ব্যর্থবিহীন সুস্পষ্ট বাণী। সাধু পল লিখেছেন,—'যীশুব দৃষ্টিতে ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই, আর্য নেই, অনার্য নেই,—প্রভু নেই, দাস নেই,—খৃষ্টই সর্বস্ব এবং সকলেব মধ্যেই তিনি বর্তমান।'

কিন্তু যখন নাটালে পৌঁছলাম তখন দেখলাম মানুষে মানুষে যে বৈষম্যকে প্রতিহত করতে সাধু পল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক সেই বৈষম্য নাটালের খৃষ্টীয় সমাজকে কলংকিত করে রেখেছে। জাতিভেদ যে কেবলমাত্র সরকারী কাজে কর্মে প্রশ্রয় পাচ্ছে তাই নয়, এই অন্যায়কে আইনের সাহায্যে খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যেও পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গির্জা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতিতে জাতিতে সামাজিক গণ্ডীবদ্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে,—জনমতও এই ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে।

এই ভেদবুদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল অতীতে, যখন বুয়র শাসনের যুগে আইন ছিল যে রাষ্ট্রে বা ধর্মে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়দের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই,—উভয়কে কিছুতেই সমদৃষ্টিতে দেখা হবে না। সেই অতীত কলংকের দায়ভাগ গ্রহণ করে সেই একই নীতিহীন পন্থা নাটালের বৃটিশ অধিবাসীরাও বহন কবছে এবং একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

প্রথম যেদিন আমরা ডারবানে পৌঁছলাম সেই দিনই এই জাতিভেদের কুসংস্কার আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল। তাবপর অবিলম্বে দিনে দিনে এই সংস্কারেব নানা কুৎসিত অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হতে লাগল। এই পাপ বিষাক্ত সংক্রমণের মতো সুস্থ সমাজদেহের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এই স ক্রমণ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক দিন থেকে শুরু হয়েছিল এবং এই ব্যাধিকে রোধ করবাব চেষ্টাও বলতে গেলে কিছুই হয়নি। খৃষ্টান সমাজের বিভিন্ন শাখার গভীবে ক্রমে এই বিষ বাসা বেঁধেছে।

এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অতি স্পষ্ট,—ইসলাম ধর্মাবলম্বী-দের মধ্যে জাতিভেদেব স্থান নেই। আমাদেব পক্ষে অতি লজ্জার কথা যে খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ এ পর্যন্ত এই জাতিভেদেব বিরুদ্ধে নিতান্ত ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মৌখিক ধর্মকথার সঙ্গে ব্যবহারিক

আচরণের কোন সম্বন্ধ না থাকার জন্যে এই দুর্বল আত্ম-অবিশ্বাসী প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি।

এক খৃষ্টান গির্জায় যাজনা করার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছিলাম। মহাত্মা গান্ধী আমার যাজনা শুনতে চেয়েছিলেন বলে উইলি পিয়ার্সন তাঁকে গির্জায় নিয়ে এসেছিল। পরে আমি জানলাম যে গান্ধীজী কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী বলে তাঁকে গির্জার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় আমার লজ্জার পরিসীমা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে যেন তাঁর আপন মন্দিরদ্বার থেকে ওরা দূর করে দিয়েছে। কিন্তু এমনি ব্যবহারই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় খৃষ্টানদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি কেপ টাউনে গিয়েছি। শুনেছিলাম, নাটাল অপেক্ষা কেপ টাউনে বর্ণবিদ্বেষের উষ্মা অনেক কম। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে দেখাশুনা করবার জন্যে গান্ধীজী তাঁর পুত্র মণিলালকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন।

মণিলাল যে কী ভাবে আমার সেবা-যত্ন করেছিল তা বলবার নয়। আমিও তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতাম। একদিন মণিলাল অতি উদ্‌গ্রীবভাবে আমাকে জানাল,—কোনো গির্জায় বসে আমার উপদেশ সে একবার শুনবে এই তার বড়ো সাধ। শহরের উপকণ্ঠে একটি গির্জা ছিল,—সেখানকার ধর্মযাজক ছিলেন ভারতীয়দের সুহৃদ। সেই গির্জায় আমি মণিলালকে নিয়ে গেলাম।

এই গির্জার যাজক আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। প্রার্থনা-সভা আরম্ভ হবার আগে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে ও মণিলালকে চা খাওয়ালেন। এ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় কাটল দেখে আমি প্রস্তাব করলাম প্রার্থনাসভায় মণিলালকে নিয়ে যাব। ধর্মযাজকের

মুখ ভার হোলো এ কথা শুনে। তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নিশ্চয় আপত্তি করবে উপাসকমণ্ডলী। গির্জার মধ্যে শ্বেতকায় উপাসকদের পাশাপাশি বসে কোনো ভারতীয় বালক যীশুর বাণী শ্রবণ করবে,— অসম্ভব এ প্রস্তাব! কিন্তু বেচারী মণিলালের আকাংক্ষা আমি মিটাই কী করে? শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ মীমাংসা হোলো। মণিলাল গির্জায় ঢুকবে না,—গির্জার দোরগোড়ায় বসে কান পেতে ধর্মোপদেশ শুনবে।

একের পর এক এমনিধারা নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা আমি পেতে লাগলাম। একটি ঘটনার কথা বলব,—কারণ ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

কেপ টাউনের সেন্ট জন গির্জায় কোনো বর্ণবিভেদ ছিল না। এক রবিবার প্রত্যূষে আমি সেই গির্জায় হোলি কমিউনিয়নে যোগ দিলাম। খৃষ্টের পূতাবশেষ সমস্ত উপাসক গ্রহণ করেছেন, এবার আমার ধর্মোপদেশ দানের পালা। হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিশীর্ণা বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা প্রার্থনাসভার শেষ প্রান্ত থেকে শ্লথ চরণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত ইউরোপীয়ান উপাসকরা যতোক্ষণ না নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসেন ততোক্ষণ ঐ কৃষ্ণকায়া বৃদ্ধা সকলের পিছনে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি পূতাবশেষ নিয়ে তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম। গভীরতম ভক্তিতে মাথা নিচু করে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসলেন।

সহসা আমার মনে হোলো—এই নতজানু নিগ্রো বৃদ্ধার মূর্তি যেন সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশের আত্মার প্রতীক,—যে আত্মা ইউরোপের অগণিত অন্যায়ের বেদনায় মুহ্যমান নতশির। বিনম্র সহিষ্ণুতার অনন্ত শক্তি দিয়ে শ্বেত জাতির এই অশেষ অন্যায়কে আফ্রিকা আপন শিরে গ্রহণ করেছে। এই নির্বাক নিরুদ্ধ শক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার আসন্ন মুক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

এই গির্জায় ধর্মোপদেশ দানের জন্যে এখানকার ডীন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। চারিদিকে দিনে দিনে যে সমস্ত নিষ্ঠুর দৃশ্য আমি দেখেছি তাতে আমার সমস্ত অন্তর তখন জ্বলছে। আমি বললাম,—এই আফ্রিকা পরম-পিতা একেশ্বরকে ভুলেছে,—তার বদলে এখানে দুই দেবতার পূজা। এক দেবতার নাম স্বর্ণতৃষা, আর এক দেবতার নাম বর্ণবিদ্বেষ। বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই উপাসনা-সভায় আমার মনের সমস্ত পুঞ্জীভূত অনুভূতি সেদিন আমি প্রকাশ করে ফেললাম।

পবে আমাব সমস্ত মন এক গভীর হতাশায় ভবে গেল। মনে হোলো,—''ই উপাসনাসভা, এ যেন এক শ্বেতপাথরের কঠিন দেয়াল,—এই দেওয়ালে একটি মাত্র বেখাপাতও আমি করতে পারিনি। তবে একটি লাভ হোলো আমার। বিধান-সভার সদ্য-অবসবপ্রাপ্ত সদস্য জে এক্স মেরিম্যান আমাকে একটি সহৃদয় পত্র লিখে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন,—আপনি জেনে রাখুন যে এই আফ্রিকাতে এখনো দু-একজন আছেন যাঁরা ঈশ্ববের নামে শয়তানের কাছে মাথা পাতেন নি। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন সাধু আছেন, যাঁব সঙ্গে আপনাব সাক্ষাৎ হলে আমি খুশি হব। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম।

এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মাশোনাল্যাণ্ডের আর্থাব শার্লি ক্রিপস। অক্সফোর্ডে তাঁব শিক্ষা। তরুণ বয়স, অপূর্ব কাব্য-প্রতিভার অধিকারী। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে সরল অনাড়ম্বর খৃষ্টীয় জীবন তিনি যাপন করেন। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পবিচয় হয় ও ক্রমে এই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

আফ্রিকায় বাণ্টু অধিবাসীদের আমি এই সময় সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে শিখি। তাদেব শীর্ণশ্রান্ত মুখে তাদের শতাব্দীপারের

বেদনার রহস্য আমি অনুভব করি। আফ্রিকার মর্মরহস্যের প্রথম পরিচয় আমি লাভ করি অলিভ স্রাইনারের কাছ থেকে। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার আর এক মহিলার কাছে আমার এই শিক্ষা পূর্ণতর হয়। এই মহিলা মিস মল্টেনো। অলিভ স্রাইনারের মতো এই মহিলাও শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি কোনো দিন। দুর্গত ও উৎপীড়িতের হয়ে সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর শ্বেত-শুভ্র চুলে, তাঁর মুখের অসংখ্য বলিরেখায়।

ভারতীয়দের এক সভায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি—

দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমরা থাকতে চাও আমি জানি। কিন্তু এ জন্যে যদি নির্যাতন বরণে প্রস্তুত না হও তাহলে জননী আফ্রিকার উপযুক্ত সন্তান বলে দাবী করতে তোমরা পারবে না। নির্যাতন-বরণ আমাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার—সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ। আফ্রিকাতে যদি থাকতে চাও, তাহলে এই আফ্রিকাকে মাতৃভূমি বলে মানতে হবে, নির্যাতিতা জননীর সমস্ত বেদনাকে বহন করতে হবে।

ভারতীয়দের কাছে মিস মল্টেনো তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। বুয়র মেয়ে তিনি, বাস করতেন এক নির্জন গোলা-বাড়িতে। চারিদিকে নিশ্চুপ পর্বতমালা, মাঝে মাঝে বেগবতী ঝরণা, রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে আকাশভরা অসংখ্য নক্ষত্রের আলোক-ইঙ্গিত। মুষ্টিমেয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিল তাঁর যাওয়া-আসা। সেই বৈচিত্র্যহীন দীন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটাতে কাটাতে এই ছায়াভূমি আফ্রিকার আত্মশক্তির ত্রিধারাকে তিনি উপলব্ধি করলেন।

একটি শক্তিধারা সঙ্গীত। এই মেদুর আকাশ ও শান্ত পর্বতসানু-লালিত মহাদেশে বৃটিশ ও ওলন্দাজের কর্কশ কণ্ঠও কোমল হয়ে যায়। মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত প্রেমসঙ্গীত যেমনভাবে আফ্রিকার মানবাত্মাকে নাড়া দিতে পারে, এমন আর কিছুই পারে না। অন্তরের সমস্ত তিক্ততাকে সঙ্গীতের প্লাবন হরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় শক্তি বেদনাধারা। আফ্রিকা যতো নির্যাতন সহ্য করেছে পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো মহাদেশ তা করেনি। কিন্তু এতো নির্যাতনেও আফ্রিকার হৃদয় কঠিন হয়নি, কোমলই হয়েছে। বহু যুগের সহিষ্ণুতা-নিষিক্ত তাদের বেদনা-করুণ ভাষা একদিন বিশ্বমানবের মর্মে গিয়ে পৌঁছবেই।

তৃতীয় শক্তি আফ্রিকার নারীজাতির নৈতিক শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তিরও পূর্ণ প্রকাশ হবে। সারা পৃথিবীতে সর্বত্র নারীজাতিই সৃষ্টির বোঝা বহন করে। আফ্রিকার নারীর মতো এতো গুরুভার বোঝাও কোনো নারী বহন করেনি। দুর্বহ ভার ও দুর্বিসহ বেদনার অগ্নিপরীক্ষায় আফ্রিকার নারী-চরিত্র নিকষিত স্বর্ণের পবিত্রতা লাভ করেছে।

মিস মণ্টেনো যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন তাঁর বেদনা-বিধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে আমি তাকিয়েছিলাম। আফ্রিকার ভূমিতলে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আবার নূতন করে উপলব্ধি করেছিলাম যে খৃষ্টের বাণী সর্বযুগে প্রসারিত, খৃষ্টের আশীর্বাদ সর্বজাতির অধিকার। আরো উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রেমই সর্বশক্তিমান,—সমুদ্যত বিক্ষোভের শক্তিও এই শক্তির কাছে ম্লান। এই প্রেমের শক্তিবলেই আফ্রিকার যুগসঞ্চিত বঞ্চনার অবসান সম্ভব।

মিস মণ্টেনো বলেছিলেন,—আফ্রিকাবাসীর নির্যাতন-বরণ ঈশ্বরদত্ত অধিকার। কয়েক দিন পরে নাটালে একটি অন্তরস্পর্শী ঘটনায় মিস মণ্টেনোর এই কথার তাৎপর্য আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

ডারবানের ভারতীয় সমাজ আমার জন্য একটি বিদায়-সভার আয়োজন করেছিলেন। লক্ষ্য করলাম,—এই সভায় কয়েকজন জুলু উপস্থিত। এর পূর্বেও অন্যান্য সভায় কিছু কিছু জুলু আমি দেখেছি।

আমি যখন বক্তৃতা দিতাম তখন তারা স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের আচরণে গম্ভীর মর্য্যাদার প্রকাশ ও মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার ছায়া আমাকে আকৃষ্ট করত।

এই বিদায়সভার অবসানে আমি মিঞা খান নামক এক বৃদ্ধ মুসলমানের দোকানে ফিরে গেলাম। এইখানেই আমি থাকতাম। মিঞা খানের সঙ্গে চা পান করতে বসেছি এমন সময় দুজন জুলুনেতা সেখানে এসে উপস্থিত হোলো। আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে চা পান করতে নিমন্ত্রণ করলাম। তখন একজন জুলু আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিঞা খানকে স্থানীয় ভাষায় বললে,—আমরা এঁকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

মিঞা খান আমাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বললাম,—নিশ্চয়ই, আপনি অকপটে বলুন কী আপনার প্রশ্ন?

আমার চোখে চোখ রেখে সেই জুলুনেতা তখন বললে,—ভারতীয়দের সঙ্গে আপনি যখন কথা বলেন তখন আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে তাদের জন্যে প্রাণ দিতে আপনি প্রস্তুত। আমাদের জন্যেও প্রাণ দিতে কি আপনি পারেন?

আশ্চর্য এই প্রশ্ন! এই প্রশ্ন এতো বেদনা-উদ্‌গ্রীব যে সোজা বুকের মধ্যে গিয়ে বেঁধে। এই প্রশ্ন এতো সহজ যে সহজ উত্তর ছাড়া এর কোনো উত্তর নেই। হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কেমন ভাষায় দেব, তাই ভাবতে আমার এক মুহূর্ত দেরি হোলো। তারপর দ্বিরুক্তি না করে সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিলাম। বললাম,—হ্যাঁ পারি। সময় যেদিন আসবে সেদিন আপনাদের জন্যেও প্রাণ দেব, সে জন্যে আমি প্রস্তুত।

উত্তর দিতে মুহূর্তমাত্র দেরি হয়েছিল আমার। সেই মুহূর্তে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো এই সত্য আবার আমার অন্তরে উদ্‌ঘাটিত হোলো যীশুর সেবায় জাতিভেদের স্থান নেই, তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান। তাঁর অনন্ত প্রেমসমুদ্রে সর্বজাতির সর্বধারা এসে মিশেছে।

আর একজন মহাপ্রাণবতী মহিলার সঙ্গে আমার এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ডবলু ই গ্ল্যাডষ্টোনের কন্যা মিসেস ড্রু। তাঁর ভ্রাতা লর্ড গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল। ভারতীয় সমাজের এই সংগ্রামে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল। দুর্গত মানবাত্মার গভীর বঞ্চনাকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন,—তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে করুণাধারা ঝরে পড়ত। মহাত্মা গান্ধী ও গান্ধী-পত্নীব প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তায় আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতাম।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই প্রথম দর্শনেই আমাদের উভয়ের হৃদয় এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়,—সে বন্ধন এ জীবনে কখনো শিথিল হবে না। আমাদের দুজনেব হৃদয়ের মাঝখানে যে প্রেম-মন্দাকিনী প্রবাহিত,—সে স্রোতে কোনো ভাঁটা নেই।

মহাত্মা গান্ধীর বেদনাক্লিষ্ট কঠোর জীবনের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করেছি নির্যাতন-সহিষ্ণুতার সর্বজয়ী পরমশক্তি। গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে আমি ভয়কে জয় করতে শিখেছি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে প্রদীপ যেমন জ্বলে,—আমার চরিত্রের যা কিছু নিষুপ্ত শুভবোধ তাঁর চরিত্রস্পর্শে তেমনি জাগ্রত হয়েছে,—উজ্জীবিত হয়েছে আমার প্রেরণা। সামান্যতম প্রাণ যেখানে নির্যাতিত,—সেখানেই তাঁর অনন্ত মমত্বভরা প্রাণ ছুটে গেছে। এমনিভাবে অবিশ্রাম ছুটে ছুটে তাঁর দুঃখ-সন্ধানী আত্মা বিরামহীন আবেগে সেই অনির্বচনীয়েরই সন্ধান করেছে,—যাঁর নাম সত্য, যাঁর অপর নাম ঈশ্বর।

একটি উষ্ণ দিনের কথা মনে পড়ে। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়া শহরেব কাছে এক নদীতীরে মহাত্মার সঙ্গে আমি বসে আছি। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করছিলাম এই বলে,—সৃষ্টির উন্নততর প্রাণী নিম্নতর প্রাণীকে

ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, এটা প্রকৃতির নিয়ম,—অতএব মানুষ যে পশুপক্ষী খায়, সেটা নীতিবিরুদ্ধ নয়।

গান্ধীজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন,—কিন্তু খৃষ্টান হয়ে তুমি এই যুক্তি কী করে দাও? তুমি তো বিশ্বাস করো যে পরম-প্রভু মানব-জন্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবনকে রক্ষা করবার জন্যে, ধ্বংস করবার জন্যে নয়। তোমাকে আমাকে সকলকে রক্ষা করবার জন্যেই যীশুখৃষ্ট আত্মবলিদানকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তবে? জীবন নেওয়া নয়, জীবন দেওয়া,- এই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?

তাঁর এই কয়েকটি কথার মধ্যেই গান্ধীজীর জীবনসত্যকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। গান্ধীজীর জীবনের ব্রত শুধু দেওয়া, -কিছু নেওয়া নয়—চরম আত্মদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম অবিশ্রাম শুধু দেওয়া,—এই দেওয়ার মধ্যেই অনির্বাণ আনন্দ।

প্রথম থেকেই অন্তরের সূক্ষ্মানুভূতি দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে গান্ধীজী একজন অশেষ ব্যক্তিসম্পন্ন ধর্মনেতা তো নিশ্চয়ই,—যাঁর আহ্বানে অসংখ্য নবনারী বিগলিতচিত্তে অসহনীয় দুঃখ-বিপদকে বরণ করে নেয়,- কিন্তু এইটুকুই গান্ধীজীর পরিচয় নয়। ঐ আকাশের তারকাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, তেমনি অবিনশ্বর চিরন্তন চিরনূতন চিরসত্যের মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী। সমস্ত বাধা-বেদনাকে অতিক্রম করে কে? সমস্ত অন্যায়কে হরণ করে কে? সমস্ত শক্তির অধিরাজ পরম শক্তি কী? অনন্ত-সহিষ্ণু প্রেম। গান্ধিজীর এই একমাত্র বাণী। এই বাণী পরম সত্যের বাঙ্ময় রূপ। মিস মণ্টেনোও গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই একই সত্যের প্রতিধ্বনি করতেন, যখন তিনি বলতেন, —সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ।

এই সত্যের ব্যবহারিক পরীক্ষা আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের মধ্যে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেখানকার নিত্য-নির্যাতিত ক্ষুদ্রকায়

ভারতীয় সমাজের অবস্থা দেখে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টভক্ত-সম্প্রদায়ের কথা আমার মনে পড়ত। সহজ সরল অন্তরমাধুর্যভরা সামান্য একটি গোষ্ঠী,—তাদের ঘিরে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের বিক্ষুব্ধ হলাহলবন্যা।

মহাত্মা গান্ধীর ফিনিক্স আশ্রমে গিয়ে প্রথম দিনই এই চিত্র স্পষ্ট প্রতিভাত হোলো। গান্ধী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুবর্তীরা এই আশ্রমে তাঁদের ধর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন। শিশুদের মহাত্মা বড়ো স্নেহ করতেন। শ্রীযুক্তা গান্ধী ও তাঁর পুত্ররা তখনো কারারুদ্ধ। আমি গিয়ে দেখলাম,—এই নিরাত্মীয় মানুষটিকে প্রিয় শিশুর দল ঘিরে রয়েছে। ভারতীয় অচ্ছুৎ সমাজের একটি শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে তিনি বসে আছেন; আর একটি রুগ্ন পঙ্গু মুসলমান বালক তাঁর কোলের একটি কোণ দখল করবার চেষ্টা করছে। আমাদের সঙ্গে আহার করবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে একটি জুলু খৃষ্টান রমণী।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলোচনা হোলো। বৃটিশ ও বুয়রদের সম্বন্ধেও অনেক কথা হোলো, কিন্তু কোনো কথায় হিংসা নেই উষ্মা নেই জ্বালা নেই। দিনান্তের সেই অবসন্ন অন্ধকারে ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি কথা কেবলই আমার মনে পড়তে লাগল,—

'যারা বিশ্বাস করে, তাদের এক প্রাণ এক আত্মা; তারা একসঙ্গে আহার করে,—প্রভুর নামে দুঃখববণের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে,—সেই একই আনন্দে তারা বিভোর।'

সরকারী পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও চুক্তিদাস-প্রথার বীভৎস রূপেব সঙ্গে পরদিন সকালেই আমার পরিচয় হলো। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি বেড়াতে বার হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা ইক্ষু বাগিচার ধারে একটি মূর্তি আমাদের চোখে পড়ল। পথের পাশে গুঁড়ি মেরে রয়েছে একটা কৃষ্ণকায় লোক। মহাত্মা গান্ধীর কাছে এসে সে তাঁর পদধূলি নিল ও নিজের নগ্ন পিঠটা খুলে তাঁকে দেখাল।

চাবুকের আঘাতে আঘাতে সমস্ত পিঠটা ওর ক্ষতবিক্ষত। বুঝলাম, —অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে লোকটা বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে ও গান্ধীজীর আশ্রয় চাইছে। আমি কিছুটা পিছনে ছিলাম,—এখন লোকটির পিঠের ক্ষতগুলি পরীক্ষা করবার জন্যে সামনে এগিয়ে এলাম। লোকটি যখনই দেখল আমি ইউরোপীয়ান, তখনি সে আতংকে কুঁকড়ে গেল,—এই বুঝি আবার তাকে আমি মারব! আমি শ্বেতকায় হলেও তার শত্রু নই,—বন্ধু,—এ কথা তাকে বুঝিয়ে বলা সহজ হোলো না। আমি যখন প্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তার চোখের সেই ভয়ার্ত বিহ্বল দৃষ্টি বহু দিন আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

চারিদিকের এই সব ঘটনা ও দৃশ্যের মাঝখানে দেশ থেকে সেই তারবার্তাটি এসে পৌছলো, যেটি আসবে বলে সমানে আমি ভয় করছিলাম। আমার মা আব ইহজগতে নেই।

নিবাত্মীয় বিদেশে বসে এই সংবাদ আমি পেলাম। তখন শ্রীযুক্তা গান্ধীব সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভাবতীয়া জননী আমাকে মাতৃবিয়োগ-শোকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। ভারতীয় জননীবৃন্দ,—প্রেমময়ী সান্ত্বনাদাত্রী তোমরা,—বিদেশী সন্তানকে কী পবিত্র স্নেহসুধাদানে তোমরা তৃপ্ত করেছ! শোকেব মর্মান্তিক আঘাতে যে করুণ সান্ত্বনাস্পর্শে যে অকপট ভালোবাসায় তোমরা আমাকে অভিষিক্ত করেছ, সে অপবিশোধ্য ঋণ সাবাজীবনে ভুলব না।

যীশুখৃষ্ট ও জাতিভেদ

মাতৃবিয়োগের ব্যক্তিগত বেদনা যখন আমি পেলাম, তখন আমার চারিদিক ঘিরে দুঃখ-বেদনার অন্ত নেই। সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে নিগৃহীত ভারতীয়ের বেদনা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আবার আরম্ভ হবে বলে মনে হচ্ছে। সেই শোকদুঃখ-ক্ষণে খৃষ্টরাজ্য সম্বন্ধে এক নূতন ভাবনায় আমার চিত্ত আচ্ছন্ন হোলো,—মনে হোলো খৃষ্টেব মূর্তি স্পষ্টতর ভাবে আমার চোখেব সামনে যেন ফুটে উঠেছে। আমি পিতৃদেবকে লিখলাম যে এখানকাব সংগ্রাম শেষ হলেই আমি ইংলণ্ড হয়ে ফিবব। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাব কাজকে আমাব পিতৃদেব সমগ্র অন্তর দিয়ে সমর্থন কবেছিলেন। তাঁর ও আমাব মধ্যে মনেব এমন নিবিড় সংযোগ বহু বৎসবেব মধ্যে হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকাব ঘটনাবলীব পবিপ্রেক্ষিতে দুটি জিনিষ আমাব কাছে স্পষ্ট হোলো। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁব অনুচববৃন্দেব প্রচেষ্টাব মধ্যে আমি খৃষ্টেব আদর্শকে প্রত্যক্ষ করলাম,—দেখলাম অন্যায়কে তাঁবা পবম সহিষ্ণুতার সঙ্গে ববণ কবছেন, অশুভকে তাঁবা জয় কবছেন শুভ দিয়ে। যীশুখৃষ্ট প্রচাব কবেছিলেন বিশ্বপ্রেম আব প্রাচীন ভাবতে বুদ্ধ শুনিয়েছিলেন অনন্ত করুণাব বাণী। আমি এই প্রথম উপলব্ধি কবলাম যে এই দুই মহামানবেব শিক্ষাব মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই চেতনায় একই আদর্শে একই ধাবায় এই দুই শিক্ষা মানবসাধনা ও মানবভাগ্যের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত কবেছে। সাধু জেমসের পত্রের সেই মহান বাক্যটি বাবে বাবে আমাব মনে বাজতে লাগল,—

'প্রতিটি শুভপ্রসাদ প্রতিটি মঙ্গলবিধান তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত যিনি আলোকের পিতা। সকলকে তিনি সমভাবে আলো দেন, কোথাও আলো আর কোথাও ছায়া,—এ নয়।'

দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁব অনুচবদেব এই খৃষ্টাদর্শ-প্রণোদিত আত্মদানেব পাশাপাশি খৃষ্টীয় সমাজেব এ কি আদর্শবিবোধী অন্যায় কার্যাবলী আমি প্রত্যক্ষ কবলাম!

প্রভু খৃষ্ট বলেছেন,—'সুনীতিব পবিচয় কথায় নয়, কাজে। বৃথা বাক্যে নয়, প্রকৃত কর্মেব মধ্য দিযেই চবিত্রেব প্রকাশ।' আমি ভাবলাম,—এই যাবা অত্যাচাবিত অখৃষ্টান আব যাবা অত্যাচাবী খৃষ্টান,—আমাব প্রভু খৃষ্ট কোন্ দলে? ধর্মেব পবীক্ষা কর্মেব মধ্যে। যে ধর্ম শুধু বাক্যেব উপব প্রতিষ্ঠিত, সে বাক্য যতো প্রাচীনই হোক,—সেই ধর্ম বৃথা,—সেই বৃথা ধর্মকে খৃষ্ট রূঢভাষায় অবজ্ঞা কবে গেছেন। এই অন্তঃসাবশূন্য ধর্মকথা-সর্বস্ব ধর্ম ছলচাতুবী ছাড়া আব কিছু নয়,—এই খৃষ্টেব বিচাব।

জেনাবেল স্মাট্সেব সঙ্গে আলোচনাব জন্যে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রিটোবিযাতে অবস্থান কবছিলেন, তখন আমিও তাঁব সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, উন্মুক্ত আকাশেব নিচে আমবা বাত্রে বিশ্রাম কবতাম। অনেক বাত্রেই আমাব প্রথম দিকে ঘুম আসত না,—অসংখ্য তাবকাখচিত বিপুল বহস্যমণ্ডিত সীমাহীন কৃষ্ণ আকাশেব দিকে স্তব্ধ-বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে থাকতাম। অনেক দিন আবাব সূর্যোদযেব বহু পূর্বে ঘুম ভেঙে যেত। সমস্ত জগৎ তখন নিদ্রামগ্ন। প্রত্যূষ-পূর্বেব সেই অচঞ্চল অন্ধকাবে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা আমি একলা চুপ কবে বসে থাকতাম।

মনে মনে ভাবতাম,—কী বিবাট এই সৌবজগৎ, তাব অন্যতম গ্রহ এই পৃথিবীও কতো বিবাট! এই বিবাট বিশ্ব-মাঝে এই অনন্ত

কালসমুদ্রে মানুষের জীবন কতো সামান্য, কতো ক্ষণিক। যেন অন্তহীন অন্ধকারে মুহূর্তস্থায়ী একটি শিখা! নিঃসীম জড়সমুদ্রে চৈতন্য তরঙ্গের পলকস্থায়ী স্পন্দন! মানুষের জীবন সামান্য বলেই এতো মহার্ঘ, হ্রস্ব বলেই এতো মূল্যবান। সেই জন্যেই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে ঈশ্বরের কাজে ব্যয়িত করতে হবে এবং সেই কাজের নির্দেশ ও প্রেরণা দেবেন পরম-প্রভু খৃষ্ট।

চুক্তিদাসের মুক্তি-আন্দোলনের উত্তেজনা চরম থেকে চরমতর হয়ে উঠছে। মহাত্মা গান্ধীর সহায়তায় আমি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের নিভৃততর স্তর থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীর অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিত্বের রহস্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি। গান্ধীজী সম্পূর্ণভাবে হিন্দু অথচ তিনি পরম খৃষ্টান খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী তাঁর চরিত্রে প্রকট,—খৃষ্টের আদর্শে সমর্পিত তাঁর জীবন।

এই বিষয়ে আমি অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলাম। আমার বন্ধু শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই পত্রাবলী মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু মানবাত্মা এক। বিভিন্ন ধর্মমতে বাহ্যিক পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত আপাত পার্থক্যের প্রান্তে এক গূঢ় গভীর ঐক্য। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ইতিহাসের আদিম ঐক্য মাত্র নয়,— এই ঐক্যবোধ অন্তর্মুখী উপলব্ধির। সকল মানুষেরই এক পরম-পিতা,— তিনি তাঁর সকল সন্তানকেই সমানভাবে স্নেহ করেন,— প্রতি সন্তানকে প্রেমের আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি ও তাঁর নিজের প্রতি টানেন। এই উপলব্ধি যদি সত্য হয়, তাহলে মানুষে মানুষে ভাইএ ভাইএ ভেদাভেদের স্থান কোথায়?

ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রতিভূ যীশুর এই সর্বপ্লাবী করুণার সঙ্গে আমি কোনো প্রকারের সংকীর্ণ ধর্মোন্মাদনাকে একসূত্রে গাঁথতে পারিনি। আথানাসিয়াসের ঘোষণা সর্বদা আমাব মুখে এসে বেধে গেছে। যারা খৃষ্টান নয়, তাদের মুক্তি নেই, অনন্ত নবকে তাদেব স্থান,—এই ঘোষণাকে আমি কখনো মেনে নিতে পাবিনি। মেনে নিতে পাবিনি যে ভাবত ও চীনেব লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিধর্মী বলে বর্বব, বিধর্মী বলে অন্ধকাব তাদেব জীবন,—জীবনেব অবসানে অন্ধ নবকে তাদেব গতি।

খৃষ্টানদেব এই ধবণেব সংকীর্ণ বিশ্বাসকে খৃষ্টনামেব অনুপযুক্ত বলে বহুদিন আমি পবিত্যাগ কবেছিলাম। এখন গান্ধীজীকে আমাব আত্মাব ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে গ্রহণ কবলাম, তাঁকে অকপটে খুলে বললাম আমাব সমস্যাব কথা। যে ঘোষণা অখৃষ্টানকে নবকযাত্রী কবে, সেই ঘোষণা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস কবিনে। অথচ খৃষ্টান যাজক হিসেবে উপাসনাক্ষেত্রে সেই ঘোষণাকে আমাকে উচ্চাবণ কবতে হয়। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাব কেমন কবে?

মহাত্মা গান্ধী আমাব এই সমস্যাব কথা অতি নিবিষ্টভাবে শুনলেন। আমাব দুবল অন্তর্দ্বন্দ্বেব জন্য তিনি আমাকে তিবস্কাব কবলেন না, ববং ধৈর্য ধববাব উপদেশই দিলেন। বললেন,—এমন দিন আসবে যেদিন খৃষ্টসেবাব উদাবতব ক্ষেত্রে আপনিই আমাব আহ্বান আসবে, সেদিন ধর্মীয় অনুশাসনেব শীর্ণ গণ্ডী আপনিই আমি অতিক্রম কবতে পাবব। পুণে প্রত্যাবর্তনেব পব সেখানে শ্রীযুক্ত গোখেলেব সঙ্গে এই একই বিষয়ে আমি আলোচনা কবেছিলাম, তিনিও আমাকে ঐ একই উপদেশ দিয়েছিলেন। শেষ পযন্ত শান্তিনিকেতনে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব অনুগ্রহে আমি মুক্তিলাভ কবতে পেবেছিলাম। সে কাহিনী পবে বিবৃত করব।

বাহিবে ঘটনাব আবর্ত,—সেই সঙ্গে মনেব মধ্যেও চিন্তাব আবর্ত। গভীবতব অভিনিবেশেব সঙ্গে আমি আমাব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে

লাগলাম,—ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্ন হতে লাগল আমার অন্তর্দৃষ্টি, যীশুখৃষ্টের স্বচ্ছ সরল স্পষ্ট বাণী আমার প্রাণে এসে বাজতে লাগল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়ে আমার আচ্ছন্ন দৃষ্টিব সম্মুখে আমি যেন নূতন আলোক দেখতে পেলাম। যে জাতিবিভেদ ও সংকীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বয়ং যীশু তাঁর ক্লিষ্ট অন্তরের কঠিন ধিক্কার উচ্চাবণ করেছেন, সেই জাতিভেদ ও সেই কুসংস্কাব তাদের কুৎসিত কুটিল প্রশ্ন নিয়ে পদে পদে আমাব সম্মুখবর্তী হতে লাগল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধর্মমণ্ডুক ফরীশীর বিপবীত উদাহবণস্বরূপ ঘৃণ্য সামারিটানকে কেন যীশু গ্রহণ করেছিলেন,—কেন তিনি ফবীশীদেব মনে প্রবলতম আঘাত দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে মদ্যব্যবসায়ী ও পাপীরাও তাদেব পূর্বে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে।

এই সমস্ত চিন্তা জাত্যাভিমান ও জাতিবৈরিতাব বিরুদ্ধে আমাব মনকে দৃঢ়তর কবে তুলল। আমি বুঝলাম,—এই অন্যায়েব বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। এ জন্যে হয়তো আমাকে আমার স্বজাতির বিরুদ্ধাচবণ করতে হবে, খৃষ্টানদেবও বিপক্ষে যেতে হবে,—তবু পিছপাও হলে চলবে না। খৃষ্টের নামে বিশ্বের দরবারে আমি সত্য সাক্ষ্য দেব, আপন জনের বিমুখতায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসাব আমার উপায় নেই। খৃষ্টান কাকে বলে? আমি খৃষ্টান-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, খৃষ্টান-সমাজের সুযোগ সুবিধা লাভ কবে বড়ো হয়েছি, খৃষ্টান-গির্জায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছি,—অতএব আমি খৃষ্টান?

খৃষ্টপ্রেমের একটি মাত্র পবীক্ষা। সমাজ-সংসারের সমস্ত স্বার্থ-নির্দেশ নির্বিশেষে অকুতোভয়ে বিবেকের নির্দেশকে যে অনুসরণ করে সেই খৃষ্টান। মানুষের নির্দেশকে অতিক্রম করে ঈশ্বর নির্দেশকে মান্য করাই খৃষ্টানের এক মাত্র পরীক্ষা। এই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে যে যাত্রা করে সে সমাজ-বন্ধন মানে না, সে জাতিস্বার্থ মানে না। আত্মীয়ের আহ্বানেও সে কান পাতে না। সে চলে পরম-পিতাব নির্দেশে, সে শুধু তার পরমাত্মীয় পরম-পিতাকেই জানে। খৃষ্টের

আপন জননী ও ভ্রাতারা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,—

'কে আমার মাতা? কেই বা আমার ভ্রাতা? ঈশ্বরের আজ্ঞা যে পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, সেই আমার ভগিনী, সেই আমার জননী।'

আজ আমার চারিদিকে যেমন জাতিগত কুসংস্কার সেই কুসংস্কার যীশুর প্রথম শিষ্যদের মনেও ছিল। তাঁরা তাঁদের সূক্ষ্মানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, যীশুর ঐশী প্রেরণা একের পর এক এই সমস্ত কুসংস্কারের বাধাবর্মকে বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলেছে। তাঁরাও তাঁদের মন থেকে এই সমস্ত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে খৃষ্টের অনুবর্তী হয়েছিলেন। খৃষ্টই তাঁদের দেখিয়েছিলেন ভেদ-বাধাবিহীন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথ।

যারা সমাজচ্যুত, যারা অবজ্ঞাত, মন্দিরে যাদের স্থান নেই,— যীশু তাদের কাছে ডেকেছিলেন,—কোলে স্থান দিয়েছিলেন। এই মহান্ দৃশ্য চর্মচক্ষু মেলে দেখেছিলেন প্রভুর প্রথম অনুগামীর দল। সর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সমাজ যাদের দূরে পরিহার করেছে প্রভু তাদেরই ভালোবাসতেন অধিক,—এই দৃশ্য তাঁর শিষ্যরা খৃষ্টের প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মূঢ় জাত্যভিমানকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিহার করার শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন,—সমাজ যাদের ঘৃণা করে, খৃষ্ট তাদেরই প্রেম করেন, সমাজ যাদের পরিত্যাগ করে, খৃষ্ট দেন তাদেরই আশ্রয়।

খৃষ্টের জীবনের মধ্য থেকে ভক্তগণ ঈশ্বরের অঙ্গুলি-নির্দেশ প্রত্যক্ষ করেন। দূরকে করো আপন, পরকে করো ভাই,—ঈশ্বরের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হলেন শিষ্যগণ। এই শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা

গৃহবন্ধন পরিহার করলেন, শুরু করলেন ঈশ্বরপ্রেরিতের অভিযান। সমাজ তাঁদের পরিত্যাগ করল,—সমাজের গণ্ডী তাঁরা অতিক্রম করলেন নির্ভয় আনন্দে।

পদে পদে কতো আতংক, কতো বিপত্তি! প্রাচীন ইহুদী গির্জা মনুষ্যসমাজকে ইহুদী ও যে ইহুদী নয়, অর্থাৎ 'জেন্টিল' এই দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। সেই গণ্ডী পার হয়ে দূর দূরান্তরে শিষ্যগণ এগিয়ে চললেন। প্রাচীন জাতিগত ও ধর্মগত কুসংস্কারকে পদে পদে তাঁরা ভাঙতে ভাঙতে চললেন। যতোই তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন ততোই তাঁদের আচ্ছন্ন দৃষ্টি সমুজ্জ্বল হতে লাগল,—ঈশ্বরকে যে রূপে পূর্বে কখনো কল্পনা করেননি, সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল,—খৃষ্টবাণীর যে উদার মহৎ অর্থ পূর্বে তাঁরা বুঝতে পারেনি, সেই অর্থ প্রতিভাত হোলো তাঁদের মর্মমুকুরে।

খৃষ্ট বলেছেন,—'ঈশ্বরই করুণা।' এই বাক্য শুধু আমার নিরুদ্ধ উপাসনাগৃহের কঠিন দেয়ালে লিখে রাখার কথা নয়— এই বাক্যের অমোঘ মন্ত্রে বিশ্বচরাচর মন্ত্রিত হচ্ছে। সেই মহাধ্বনি প্রথম ভক্তদের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। এই মন্ত্র প্রাক্তন বিশ্বাসের বদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে দেয়,—অভূতপূর্ব অকল্পনীয় সাধনার বিচিত্র-বন্ধুর পথে মানবমনকে আহ্বান করে নিয়ে যায়।

প্রেমসাধনার এই যাত্রাপথে দু-একবার থমকে দাঁড়ালেন শিষ্যগণ, প্রতিনিবৃত্ত হলেন দু-একবার। উত্তেজনা ও চিত্তদৌর্বল্যের বশে পিটার একবার খৃষ্টভক্ত 'জেন্টিল'দের সঙ্গে আহার করতে আপত্তি করলেন। সেই পরাজয়ের পংক থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন পল। কিন্তু পিছু তাঁরা শেষ পর্যন্ত হটলেন না,—আশ্চর্য তাঁদের সাহস, আশ্চর্য তাঁদের নিষ্ঠা। তাঁদের সামনে নিত্য-সমুজ্জ্বল খৃষ্টমূর্তি,—নিত্য-নূতন দ্বার খুলে নিত্য নূতন পথসন্ধান দিচ্ছেন প্রভু, বলিষ্ঠ হাতে ভেঙে দিচ্ছেন যুগসৃষ্ট কঠিন শৃংখল, মোচন করছেন যুগ-সঞ্চিত আবর্জনা। খৃষ্টের প্রেম পরম-পিতার আশীর্বাদ,-সেই অনন্ত প্রেম গোষ্ঠীর

গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানবসমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

খৃষ্ট-সভ্যতার প্রাথমিক অভিযানেব সংক্ষিপ্ত পরিচয় হোলো এই। এই অভিযান মানব-ইতিহাসের এক মহৎ প্রগতি। এই অভিযান ও সংস্কাবেব বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম মানবাত্মাকে এক উদাব মুক্তির অমূল্য ঐশ্বর্য দান করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে দেখলাম, উদাব সর্বমানবিক খৃষ্টীয় সভ্যতা জাতিভেদেব আঘাতে খান্ খান্ হতে চলেছে। খৃষ্টের আদি শিষ্যদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি যেন উপলব্ধি কবলাম। আমি বুঝলাম, আমাকেও পিছিয়ে পড়লে চলবে না, শংকা নিয়ে কুণ্ঠা নিয়ে দূবে সরে থাকলে চলবে না। খৃষ্টের সেই আদি শিষ্যদেব মতো নির্ভয় বলিষ্ঠ হতে হবে আমাকে। যুদ্ধ করতে হবে আমাকে। খৃষ্টের উদাব আহ্বানকে যাবা জাতিভেদেব সংকীর্ণ কোলাহলে লুপ্ত করতে চায়, সাধু পলেব মতো তাদেব মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আমাকে।

এও আমাকে স্বীকাব কবতে হবে যে, যাবা নিজেদের খৃষ্টান বলে না, তাদেবও অন্তরে খৃষ্ট আছেন। তাদেরই দলে আমাকে যোগ দিতে হবে,—জাতির নামে ধর্মেব নামে যারা মানুষকে মানুষেব কাছ থেকে পৃথক করে রাখে তাদের দলে আমাব থাকলে চলবে না। আমি জানি আমার পক্ষেই ঈশ্বর আছেন,—যে ঈশ্বর ব্যক্তির গর্বকে প্রশ্রয় দেননা, যে ঈশ্বর সমভাবে করুণা করেন সর্বমানবকে।

এমনি পণ যে কেবল আমি একাই করেছিলাম তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আরো অনেক সহৃদয় ও ধর্মপ্রাণ শ্বেতকায় খৃষ্টান আমার মতে একমত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর পত্নীর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগব্রত লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছিলেন,—এই সাধু দম্পতি

প্রকৃত খৃষ্টান, আমাদের চেয়ে অনেক মহৎ খৃষ্টান এঁরা। এ কথা শুধু কথার কথা নয়, এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যকে তাঁরা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গান্ধীর অনুগামী ভারতীয় অহিংস সত্যগ্রহীদের হিন্দু বা মুসলমান ঘরে জন্ম হলেও তাঁদের খৃষ্টীয় জীবনাদর্শ যে কোনো খৃষ্টানের চেয়ে অনেক বড়ো। নূতন করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে করতে খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে এই কথা কেবলই আমার মনে বাজতে লাগল।

আমার মনের মধ্যে এক বিপ্লব আবর্তিত হতে লাগল অনিবার। স্বদেশে 'রবিন হুড বে'-র কাছে একদিন বিশপ ওয়েস্টকটের সঙ্গে ভ্রমণ-কালীন তাঁর কয়েকটি কথা বারে বারে আমার মনে পড়তে লাগল। দুজনে পাশাপাশি আমরা বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন লাঠির মাথায় দু-হাতের ভর দিয়ে। তারপর বলে উঠলেন,—মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যদি খৃষ্টকে অবলোকন করতে পারো, তবেই অন্তরের মধ্যে তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পাবে। তা যদি না পারলে তাহলে তাঁর সর্ব-অস্তিত্বব্যাপী অখণ্ড অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারলে না, বুঝতে পারলে না মানবপুত্র কেন তাঁর নাম।

এই কথা কটি বলার পর বিশপ ওয়েষ্টকট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন,--অনুভূতির উদ্বেলনে তাঁর সুন্দর দুটি চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। অনুভূতির বাহ্যপ্রকাশ তাঁর পক্ষে বিরল ছিল। তাঁর সেদিনকার অশ্রু তাঁর গভীর অন্তরের অমৃতধারা।

সমস্ত ধর্মমত ও সমস্ত সংস্কারের উর্ধ্বে সত্যের স্থান। অভিজ্ঞতার অসংখ্য উন্মুক্ত দ্বারপথে সত্যের আলো এসে আমার দৃষ্টিকে অভিষিক্ত করতে লাগল। আমার হাই চার্চ ধ্যানধারণার যেটুকু পরিবর্তন এ পর্যন্ত হয়েছিল, তা এই সত্যদৃষ্টির কাছে নিতান্ত সামান্যমাত্র। কিন্তু এখন

থেকে সত্যের আলোকে আমার যাত্রা। এই যাত্রাপথে কুসংস্কারের অন্ধকারের কোনো স্থান নেই। যে বিশ্বাস অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে আঁকড়ে রাখা আর সম্ভব নয়, সেই বিশ্বাস বহু-অভ্যস্ত ধর্মবিশ্বাস হলেও।

ধর্মসংস্কারের নিগড়ে যারা আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়, তাদের মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। সংস্কারের একটা নির্দিষ্ট ও নিরাপদ গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীর মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখায় কোনো ঝঞ্ঝাট নেই,—নিতান্ত নিরুপদ্রব এই ব্যবস্থা। আমারও মন সহজে এই গণ্ডী পার হতে পারেনি,—গণ্ডীর আকর্ষণই আমাকে হাই চার্চের অবলম্বন থেকে মুক্ত হতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু যে মন একান্ত আবেগে শুধু মুক্তিই চায়, কোন্ অনুশাসন তাকে বাধা দেবে? সমাজচ্যুতির কোন্ ধমক তাকে ডরাবে?

বাইবেলে এক রুগ্না রমণীর কাহিনী আছে,—সে বিশ্বাস করেছিল যে যীশুর বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করলেই রোগমুক্ত হবে। যীশু তাকে ভর্ৎসনা করেননি, করুণা করেছিলেন। যীশুর বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ সে করেছিল, আপন বিশ্বাসে রোগমুক্ত হয়েছিল। তার এই দৃঢ়বিশ্বাসের মধ্যেও ভিক্ষার দীনতা ছিল। এই দীনতা তার বিশ্বাসকে পার্থিব সংসারের সঙ্গে আবদ্ধ রেখেছিল। রোমক সেণ্টুরিয়নের অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল তার সমকক্ষ হতে পারেনি। সে বলেছিল,—প্রভু, তুমি শুধু বলো, তোমার বাণীতেই আমার ভৃত্য সুস্থ হবে। যীশুর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই মহাবিশ্বাসী ভক্ত লাভ করেছিল। প্রভু বলেছিলেন,—সত্যই এমন বিশ্বাস আমি ইস্রাইলে কোথাও দেখিনি।

উন্নত করো তোমার হৃদয়—এই মহাবাণীর অর্থ কী? আমার আত্মিক দৃষ্টিকে শুধু যে স্বর্গরাজ্যের দিকে উন্নত করতে হবে তাই নয়—পরমাত্মার প্রসাদ নীরবে কেমন করে সর্বমানবের অন্তরকে নিষিক্ত করে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতি মানবাত্মাকে কল্যাণ ও শুভকর্মের পথে পরিচালিত করে, লক্ষ্য করতে হবে,—তবে হবে অন্তরের উন্মীলন।

মহাত্মা গান্ধী ও জেনারেল স্মাটস সংক্রান্ত এই সময়কার একটি কাহিনী অতি অপূর্ব! অন্য বিষয় অবতারণা করার পূবে সেই কাহিনীটি এখন বলতে চাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কারবাসে ভারতীয় নারীদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন শ্রীযুক্তা গান্ধী। নাটালে পৌছানো মাত্র আমি জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি,--কিন্তু তিনি তখন এত অসুস্থ যে সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না। যতোদিন আমরা প্রিটোরিয়ায় ছিলাম, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর অসুস্থতার দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ আমাদের মনে লেগে ছিল। সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা যখন শুভপথে এগিয়ে চলল, তখন অন্য বন্দীদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা গান্ধীও মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল,— দিনে দিনে তাঁর দেহ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল।

এদিকে অবিলম্বে প্রিটোরিয়া পরিত্যাগ করা তখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা তখনো হয়নি, কয়েকটি প্রশ্ন তখনো বয়ে গেছে,—যে কোনো মুহূর্তেব সংকটে সব ব্যবস্থা ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। ধীবে ধীরে সব প্রশ্নের মীমাংসা হোলো, বাকি বইল শুধু চুক্তিপত্রে জেনারেল স্মাট্‌সের একটি স্বাক্ষর। এদিকে জেনাবেল স্মাট্‌স তখন দেশের এক আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। তাঁর এই স্বাক্ষরটি আদায় করতে কতোদিন দেরী হবে তার ঠিক নেই। ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর কাছে তারবার্তা এল,— তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। আমি গান্ধীজীকে অনুরোধ করলাম, -কালবিলম্ব না করে তিনি স্ত্রীর কাছে চলে যান, চুক্তিপত্রে সই আমি যথা সময়ে করিয়ে নেব। কিন্তু আমার কথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জাতীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবাব মানুষ তিনি নন। কর্তব্যনিষ্ঠায় তিনি প্রস্তরের মতো অটল, তাঁকে টলানো অসাধ্য আমাব পক্ষে। তাঁর তখনকার বিপুল মর্মযন্ত্রণা আমি আমাব নিজের মনে অনুভব করতে পেরেছিলাম,—এইটুকু মাত্র।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই আমার চোখে ঘুম আসছিল না। মধ্যরাত্র যখন পার হয়ে গেল তখন হঠাৎ আমাব মাথায় একটা চিন্তা এল। আগামী কাল প্রত্যুষে উঠেই জেনাবেল স্মাট্সেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে তাঁব সইটা আদায় কবাব চেষ্টা কবি না কেন? আগামী দিনেব প্রথম কর্তব্য মনে মনে স্থিব কবে নিয়ে আমি শান্তিতে চোখ বুজলাম।

পবদিন প্রভাতে ঠিক ছ-টা নাগাদ আমি ইউনিয়ন বিল্ডিংসে পৌঁছলাম। আমি জানতাম যে এই ধর্মঘট আন্দোলন দমনেব জন্য জেনারেল স্মাট্স প্রতিদিন অতি ভোবে পবিভ্রমণে বাব হয়ে যান। ঠিক সাতটাব সময় তিনি উপস্থিত হলেন এবং আমাব সমস্ত কথা শুনে মর্মাহত হলেন। মুহূর্তে তাঁব গভীব মানবতাবোধ জাগ্রত হোলো। আমাব কাছ থেকে চুক্তিপত্রটা তিনি দেখতে চাইলেন। চুক্তিপত্রেব উপব একবাব চোখ বুলিয়ে নিযে তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন,—সব পযেণ্ট গুলো ঠিক ঠিক আছে তো এব মধ্যে?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি চুক্তিপত্রটি সই কবে দিলেন। পবম আনন্দিত মনে আমি মহাত্মা গান্ধীব কাছে ফিবে চললাম। সেইদিনই আমবা ডাববান যাত্রা কবলাম। ট্রেণে যেতে যেতে পথিমধ্যেই সুসংবাদ পেলাম যে শ্রীযুক্তা গান্ধীব অবস্থা একটু ভালোব দিকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাব এই বচনাব পাঠকগণ মনে বাখবেন যে এসব ঘটনা প্রায কুড়ি বৎসব পূর্বেকাব কথা। তাব পব থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাব খৃষ্টীয় সমাজেব বিভিন্ন শাখায উল্লেখযোগ্য নব জাগবণ ঘটেছে। ইংবেজ ও ওলন্দাজ, উভয় জাতিব উৎসাহী নবনাবীব দল ঘনিষ্ঠতব ভাবে খৃষ্টানুসবণে ব্রতী হযেছেন। খৃষ্টশিষ্যত্বেব প্রকৃত কর্তব্যবোধেব আনন্দে বিভিন্ন খৃষ্টানগোষ্ঠী উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলন তরুণ হৃদয়ে নব উন্মাদনাব সঞ্চাব কবেছে। এই

সমস্ত দেখে মনে হয় যে, জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্যের পাপগণ্ডী বোধ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ধীরে বিদূরিত হবে। খৃষ্টজীবনের আনন্দিত আলোকে আবার ধর্মবিশ্বাসীর নয়নের কালো অপসৃত হবে, সেখানে বিরাজ করবে খৃষ্ট-হৃদয়ের প্রেম-প্রভা।

ভারতীয় সমস্যার মীমাংসাব পর আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করলাম। গোখেল তখন রুগ্ন অবস্থায় লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন,—তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল। আমার বাবাও অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছিলেন,—এই শেষ বয়সে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন গুণছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুসবণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে, আমার মা-ও তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কার্যকলাপের খবর রেখেছিলেন ও আমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। আমাদের মধ্যে স্নেহময়ী জননী আব নেই,—এতোদিন পরে বাড়ি ফিরে এই শোকেব মধ্যেও আত্মীয়-মিলনেব আনন্দে আমাদের সংসাব উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এর পর আমি ভাবতবর্ষে ফিরে এলাম,– মনে মনে এই স্থিব প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে কেম্‌ব্রিজ মিশনের স্থানীয় গণ্ডী আমাকে অতিক্রম করতেই হবে এবার,—নইলে উদারতব পৃথিবীব পথে কেমন কবে পা বাড়াব?

বহু বৎসর ধবে আমি এই পদক্ষেপের বিষয় গভীব ভাবে চিন্তা করছিলাম এবং ঈশ্বরেব পথ-নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলাম। এই সঙ্গে এই কথা সদা আমার মনে জাগত যে, ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে বিদেশী সংস্থাপনের উপর নির্ভরশীলতা। জনগণের প্রয়োজনে নবতর কর্তব্যের আহ্বানেব

জন্য নিজেকে স্বাধীন করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেখানে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে আমাকে যেতে হবে ও ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে,—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম। অতএব মিশনের বন্ধন আর আমার ভবিষ্যৎকে বেঁধে রাখতে পারবে না। যদি যীশুর পথে একান্তভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারি তাহলে নোঙরের বন্ধন ত্যাগ করে দুস্তর সমুদ্রে ভাসাতে হবে জীবনতরী।

কেম্‌ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘ ও তাঁদের পরিচালক অ্যাল্‌নাট স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে ঈশ্বর নবকর্মপথে আমাকে আহ্বান করেছেন,—সেই পথে আমাকে যেতেই হবে। অতএব এই ভ্রাতৃসংঘ থেকে আমি যখন বার হয়ে এলাম তখন এই ঘটনা তাঁদের পক্ষে সহ্য করা সহজ হয়েছিল। আমার প্রতি তাঁদের অন্তরের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের কখনো হ্রাস হয়নি,—গভীর প্রেমানুভূতি দিয়ে তাঁরা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষের নাড়ীতে তখন নবীন জীবন-স্পন্দন, প্রাচীন সমাজে জেগেছে বন্ধন-মোচনের সাড়া। খৃষ্টীয় বিশ্বাসেরও নূতন পরীক্ষার প্রয়োজন তখন সমাগত,—খৃষ্টীয় সমাজেরও নূতন পথে যাত্রা করার দিন। আমার পক্ষে আর বিলম্ব করার উপায় ছিল না,—বিলম্বের ফল মর্মান্তিক হোতো আমার পক্ষে।

সুশীল রুদ্রের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াই হোলো সব চেয়ে শক্ত। তিনি ছিলেন আমার সহোদর ভ্রাতার অধিক। তাঁর দেহে তখন এক মর্মান্তিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, যে ব্যাধি দিনে দিনে তাঁর জীবনীশক্তিকে গ্রাস করছে। তাঁর এই ব্যাধির কথা অবশ্য তখন আমি জানতাম না। তিনি নিজে জানতেন এই কালরোগের কথা,— কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অপরিসীম ছিল তাঁর নিঃস্বার্থতা। তাঁর নিজের প্রয়োজনে একদিনের জন্যও তাঁর কাছে আমাকে ধরে রাখতে তিনি চাননি।

আমার জীবনের এই পরম পরিবর্তন কী ভাবে এল তা বোঝাতে গেলে পিছনের একটি ঘটনা বিবৃত করা দরকার।

ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্ত শিখার মতো নিত্য-উজ্জ্বল হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ভারতীয় সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। মহৎ তাঁর বচনাবলী তেমনি মহান্ তাঁর জীবন। দিল্লীতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পবিচয়ের সুযোগ আমি পাইনি,— কেন না দিল্লী থেকে কলকাতা অনেক দূর। দূর থেকে তাঁর কথা আমি উইলি পিয়ার্সনের মুখে অনেক শুনেছিলাম। উইলি আগে বঙ্গদেশে ছিল ও রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিল। গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকাবে উইলি আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা বলত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পবিচিত হবার উদ্‌গ্রীব বাসনা আমার ছিল। সেই বাসনা অবশেষে চবিতার্থ হোলো ভারতবর্ষে নয়,—লণ্ডনে।

১৯১২ সালের একটি চমৎকার গ্রীষ্মসন্ধ্যা। হ্যামস্টেড হীথেব কাছে তাঁর গৃহে রদেনষ্টাইন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ববীন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে। তিনি রদেনষ্টাইনেব গৃহে আসছেন। ডবলু বি য়েটস্-ও আসবেন। 'গীতাঞ্জলি' নামক রবীন্দ্রনাথেব এক নূতন পাণ্ডুলিপিব কবিতাবলী পাঠ করা হবে।

সেদিন কবিকে আমি প্রথম দেখলাম। তাঁব কাব্যসুধা পান কবলাম,—ভারতের অন্তর-গভীবে যে মহান্ বিশ্বসংস্কৃতি নিহিত, সেই সংস্কৃতির সূক্ষ্ম নিবিড় মাধুর্যের পবিচয় আমি আমাব স্তব্ধ অন্তবেব মধ্যে অনুভব করলাম। কবি তখন লণ্ডনে অপরিচিত, - তাছাড়া তিনি তখন অসুস্থ। য়েট্স্ যখন গীতাঞ্জলি আবৃত্তি কবছিলেন কবি তখন তাঁব স্বভাবসুলভ বিনয় ও অপরিচিতের ব্রীড়া নিয়ে প্রায় সকলেব দৃষ্টির অন্তরালে এক কোণে সরে বসেছিলেন। গীতাঞ্জলির কাব্যমাধুবীর সেই প্রথম পরিচয়ে আমার হৃদয় কানায় কানায় ভবে উঠল,—আমার সে মনোভাব কথা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যেব জন্য মৌখিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনও আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। কবিও বুঝি আপন অনুভূতি দিয়ে আমাব অন্তরের অনুভূতি উপলব্ধি করলেন।

সেদিন রাত্রে হ্যামস্টেড হীথে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম,—শুধু ভাবতে লাগলাম,—আজ সন্ধ্যায় এ কী আমি দেখলাম, এ কী আমি শুনলাম,—এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক কী? বাহিবে বাত্রিব অন্ধকার,—কিন্তু আমাব অন্তব-আকাশ যেন এক আশ্চর্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

সেই দিনই বাত্রে শয্যা গ্রহণেব আগে একটি বিষযে আমি স্থিব-নিশ্চয হলাম। কবি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি তাঁব শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্থান নেব। দিল্লীব বিদেশী মিশনে বসে এই ভাবতবর্ষকে কিছুতেই আমি চিনতে পাবব না। শান্তিনিকেতনেব পটভূমিকায় এই বিচিত্র মহাদেশ নিবিডভাবে আমাব কাছে ধবা দেবে।

একটা কথা শুনে আমাব আনন্দেব শেষ বইল না যে উইলি পিয়ার্সনও এই একই বাসনা কবিব কাছে নিবেদন কবেছেন এবং কবি তাতে সানন্দে সম্মতি দিযেছেন। কিন্তু আমাব পক্ষে অবিলম্বে এমনি পবিকল্পনা নিযে অগ্রসব হওযাব উপায ছিল না। তখনো আমি মিশনেব কর্তব্য থেকে মুক্ত হইনি। কিন্তু মনে আশা বইল। দক্ষিণ আফ্রিকাব সঙ্কটময দিনগুলিব বেদনা এই আশাব আনন্দে লাঘব হোলো।

ভাবত-আত্মাব অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যরূপেব সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পবিচিত হতে কেবলই আমি চাইছিলাম। এই অধবা রূপকে কখনো বা বুঝি দৃষ্টিব বন্ধনে আমি বেঁধেছি, কখনো আবাব চকিতে তা আমাকে এডিযে গেছে। কখনো বা আমাব আকাংক্ষিত ভাবতবর্ষকে আমি প্রত্যক্ষ কবেছি পথের মানুষেব মুখে,—সেই মুখ আবাব হাবিয়েছি মুহূর্ত পবে। দিল্লীতে বসে ভাবতবর্ষকে পুবোপুবি চিনতে আমি পাবিনি। এখানে থাকতে শুধু বিদ্রোহ কবে কবেই আমার দিন কেটেছে,—সবকাবী শিক্ষাব্যবস্থাব সংকীর্ণতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিদেশী

মিশনারী কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদেশী মিশনারী আমি হতে চাইনি, আমি চেয়েছি ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলতে। এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরম-প্রভু যীশুকে প্রকৃত মানবপুত্র রূপে অন্তরে পেতে চাই, তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক প্রাণ এক আত্মা আমাকে হতে হবে,—বিদেশী বলে দূরে থাকলে চলবে না।

দিন যতোই যেতে লাগল ততই পুরাতন ধাবার প্রতি বিদ্রোহভাব আমার মনে গভীর হতে লাগল। কেন না, আমি দিনে দিনে লক্ষ্য করতে লাগলাম যে পুরাতন ধারার দিন ফুরিয়ে আসছে। অহংকার আর আভিজাত্যেব প্রাচীরের আষ্টেপৃষ্ঠে ফাটল ধরেছে। রুদ্ধ দ্বারে বাজছে নবযুগের বলিষ্ঠ আঘাত। বাতাসে নব-জীবনেব সাড়া। বন্দী বিহঙ্গ মাটিতে ডানা ঝাপটাতে আব চায় না,—উন্মুক্ত উদাব নীলাকাশে সে মুক্তপক্ষ বিস্তার করতে চায়। ভাবতের নবযুগের এই আন্দোলন আমারও হৃৎপিণ্ডে স্পন্দিত হচ্ছে,—আমারও দেহমন ছুটে বার হতে চাইছে। দিল্লীতে বসে বসে অনেক শিক্ষানবিশী কবেছি,—এবার আমি মুক্তি চাই। আর কোনো বন্ধনে আমি বাঁধা পড়ব না।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্য গোখেলের সহসা অপ্রত্যাশিত নির্দেশ যদি না আসত তাহলে আমি আরো আগেই শান্তিনিকেতনে যোগ দিতাম। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পব বিনা আয়াসে কেম্‌ব্রিজ মিশন পবিত্যাগ করা আমাব পক্ষে সম্ভব হোলো। ১৯১৪ সালে ঈষ্টারের সময় আমি দিল্লী পরিত্যাগ করলাম।

কবি তাঁর উদার হৃদয়ের মহত্ব দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে গ্রহণ করলেন। আমার খৃষ্টান ধর্মযাজকবৃত্তির কোনো প্রতিবন্ধক আশ্রম

থেকে আমি পেলাম না। আমি আমাব বিশপকে জানালাম যে, শান্তিনিকেতনের অবস্থান কালে আমি প্রতি রবিবাব বর্ধমানেব গির্জায় গিয়ে যাজনা করব। সুশীল যখন বালক ছিলেন, তখন সুশীলেব পিতা পিয়ারীমোহন রুদ্র বর্ধমানেব এই গির্জাব ধর্মযাজক ছিলেন।

ট্রিনিটির ববিবার এল। প্রভাতী প্রার্থনা সময়ে অ্যাথানেসিযান ক্রীড আমাকেই পডতে হবে। কেন না, এ গির্জাব আমিই একমাত্র ধর্মযাজক। যাবা খৃষ্টান নয়,—তাদেব অনন্ত নবকেব অভিসম্পাতবাণী নিজমুখে উচ্চাবণ কবতে হবে আমাকে।

আমি তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছি,—এখানকাব শান্তিপূর্ণ পবিবেশে ও অখৃষ্টান বন্ধুজনেব অকৃপণ প্রেমে আমাব মন বিভোর হয়ে বযেছে। আজকেব আনুষ্ঠানিক ধর্মযাজনাব পবীক্ষায কেমন কবে উত্তীর্ণ হব? কোন মুখে অভিসম্পাত দেব অখৃষ্টান মানবপুত্রদেব? আমি শেষ পর্যন্ত যাজনাব ঐ অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিলাম। কিন্তু এতেও আমাব বিবেক প্রবোধ মানল না। মনে হোলো,—আমি চুবি কবেছি, নিতান্ত কাপুরুষেব মতো সুলভ আত্ম-ছলনা কবেছি মাত্র।

শান্তিনিকেতনে ফিবে এসে যখনই কবিব নিষ্পাপ মুখমণ্ডলেব দিকে দৃষ্টিপাত কবলাম, তখনই উপলব্ধি কবলাম যে আমাব জীবন অসত্যেব বন্ধনে জডিত হয়ে বয়েছে,—এ বন্ধন থেকে আশু মুক্তি চাই। কবি আমাব চোখেব দিকে উজ্জ্বল স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি যেন মহাবিচাবেব দিনে যীশুখৃষ্টেব দৃষ্টি। তাঁর সেই পবিত্র দৃষ্টিব প্রতি আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখতে পাবলাম না,—চোখ নিচু কবে অকপটে তাঁব কাছে সমস্ত ঘটনা বললাম। প্রতিজ্ঞা কবলাম,—সত্যের সঙ্গে আব প্রবঞ্চনা কবব না, এই মুহূর্ত থেকে সত্যেব পথ থেকে মুহূর্তেব জন্যও ভ্রষ্ট হব না।

কবি প্রথমটা খুবই চিন্তিত হলেন। হঠাৎ উত্তেজনায় কোনো কিছু যেন না কবে বসি, সেই উপদেশই তিনি আমাকে দিলেন। কিন্তু মিথ্যাব শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছেছি। এই সীমান্তবেখাব উপর দাঁড়িয়ে বহু বৎসব আমি যুদ্ধ কবেছি,—যুদ্ধ কবেছি নিজের সঙ্গে, আপন মনেব দ্বিধা-সংশয়েব সঙ্গে। এইবাব আব যুদ্ধ নয়। শুধু শেষ পদক্ষেপটি ফেলতে হবে,—পাব হতে হবে গণ্ডী। আমাব কর্তব্য আমি স্থিব কবে ফেলেছি এইবাব।

দু-খানি চিঠি লেখা দবকাব, সেদিনই লিখে পাঠিযে দিলাম। একটি চিঠি লিখলাম বিশপকে, তাঁকে জানালাম কেন আমাব পক্ষে আব বর্ধমান গির্জাব ধর্মযাজকবৃত্তি কবা সম্ভব নয়। অপব চিঠিটি আমাব পিতাকে।

ভয় ছিল, আমাব চিঠি পড়ে পিতৃদেব যে আঘাত পাবেন তা তাঁব দুর্বল হৃদয় সহ্য কবতে পাববে কি না। চিন্তিত মনে তাঁব উত্তবেব প্রতীক্ষায় বইলাম। কিন্তু সুখেব বিষয় আমাব সম্বন্ধে কোনো প্রকাব দুশ্চিন্তা তিনি প্রকাশ কবলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিবে তাঁব সঙ্গে সাক্ষাতেব পথ থেকে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে জীবনে যা কিছুই আমি কবি, ঈশ্বব আমাকে বক্ষা কববেন।

এব পব থেকে কোনো বিশপেব অধীনে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মযাজকবৃত্তি আব আমি কখনো গ্রহণ কবিনি। তবে দেশে বিদেশে যেখানেই আমি গিয়েছি, সর্বদা অ্যাংলিক্যান খৃষ্টান সম্প্রদায়েব সঙ্গে আমি সংযোগ বেখেছি। খৃষ্টান সম্প্রদায়েব আমন্ত্রণে আমি কোনো কোনো গির্জায় ধর্মালোচনা কবেছি ও ধর্ম-আচবণে যোগ দিযেছি। এই কাজে আমি খৃষ্টীয় সমাজেব কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীব গণ্ডীকে স্বীকাব কবিনি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমাব মনে আছে যে ঈশ্বব যে কাজেব জন্য আমাকে প্রস্তুত কবেছেন ও যে কাজ আমাব প্রতি নির্দিষ্ট

করেছেন,—সে কাজ পুরোহিতের নয়, পরিব্রাজক ও প্রচারকের। অনেক বৃথা ভ্রমণের পর তিনি আমাকে সত্যপথে টেনে এনেছেন,—এই শেষহীন পথের নিরুদ্দেশ যাত্রায় আমার পথিক-আত্মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

প্রচলিত ধর্মের অন্যান্য নিয়মকানুন সম্বন্ধেও আমার সংশয় ছিল, সে সব আলোচনা বন্ধন-মোচনের পর অবান্তর। এর পর যতো দিন কেটেছে, আমার স্বস্তিবোধও ততো বেড়েছে। মুহূর্তের জন্যেও পুরানো অবস্থা ও গণ্ডীর মধ্যে ফিরে যাবার বাসনা আমার মনে জাগেনি। যে জীবন আমি যাপন করেছি তা অসম্ভব হোতো, যে কর্তব্যপথে আমি চলেছি সেই পথ কখনো আমি খুঁজে পেতাম না, যদি না গোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে আমি মুক্তি পেতাম।

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকেন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদি কাহিনী যেমনি রমণীয় তেমনি রোমাঞ্চকর। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের অবসানে একটি উপযুক্ত নির্জন স্থানের অন্বেষণ করছিলেন,—যেখানে শান্ত বানপ্রস্থে তাঁর শেষ জীবন তিনি নির্বাহ করবেন। এই অন্বেষণে তিনি এক রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে এসে পৌঁছলেন,—যেখানে শুধু দস্যুদের বাস। ভৃত্যরা তাঁর পাল্কী নামাল, আর অগ্রসর হতে সাহস করল না। বৃদ্ধ ঋষি তাদের অভয় দিলেন—পাল্কী উঠিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। সামনে তৃণশূন্য জনহীন প্রান্তরের মাঝখানে কিছু উঁচু একটি ঢিবি। তার উপর পাশাপাশি দুটি গাছ। সেইখানে তিনি থামলেন।

তখন সূর্যাস্তের অপূর্ব শোভা। সেই যুগল বৃক্ষতলে উপবেশন করে স্তব্ধ হয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ। সেই আশ্চর্যক্ষণে জগদীশ্বরের পরম উপলব্ধি এমন গভীর ভাবে তাঁর ধ্যানে বাজল যে সমস্ত রাত তিনি সেখানে আনন্দ-বিভোর জাগরণে অতিবাহিত করলেন। পরদিন প্রাতে তিনি সেই স্থানের নাম দিলেন,—শান্তিনিকেতন।

এই শান্তিনিকেতনে মহর্ষি তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। জীবন-সায়াহ্নের বহু বৎসর তিনি এই আশ্রমে বাস করেন। এখানে নিস্তব্ধ ধ্যানে তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হোতো। বিশ্বখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ তখন বালক মাত্র। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বালক পুত্রের কণ্ঠে স্বরচিত ও রাজা রামমোহন রায় রচিত ধর্মসঙ্গীত শুনতে মহর্ষির বড়ো ভালো লাগত। রামমোহন ছিলেন মহর্ষির যৌবনের গুরু,—তিনিই তাঁকে গোঁড়া হিন্দুধর্মের আওতা থেকে ব্রাহ্ম-

সমাজের উদারতর আশ্রয়ে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সংস্কার-বিমুক্ত মানবধর্মের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

মহর্ষির আশ্রম-প্রতিষ্ঠা যুগের একটি চমৎকার সত্য ঘটনা আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহর্ষি যখন তাঁর প্রিয় স্থানটিতে ধ্যাননিমগ্ন,—তখন দস্যুদলের এক সর্দার চুপি চুপি তাঁব কাছে আসে। কে তাকে বলেছিল যে ঐ গাছতুটির তলায় অনেক সোনা আছে,—তাই ঐ বৃদ্ধ ঐখানে চুপটি করে বসে থাকে। হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঠিক যখন সে সামনে এল,—সেই মুহূর্তেই ঋষি তাঁব চক্ষু উন্মীলন করলেন। তাঁর করুণ আঁখির শান্ত দৃষ্টিতে মুহূর্তে অভিভূত হয়ে দস্যু তার তীক্ষ্ণ ছুরিকা ফেলে তু-হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল,—অকপটে স্বীকার করল তার পাপ-অভিপ্রায়। মহর্ষি শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দস্যুকে আলিঙ্গন কবলেন। সেই থেকে দস্যুব জীবনধাবা পবিবর্তিত হয়ে গেল। সে মহর্ষিব ভৃত্যত্ব গ্রহণ কবল ও বাকি জীবন ধর্মপথে অতিবাহিত করল।

অতি বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি দেহত্যাগ কবেন। আমি যখন শান্তি-নিকেতনে এলাম, তখনো আশ্রমের সর্বস্থান তাঁর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত। প্রাচীন সেই তুই বৃক্ষ, যাব তলায় বসে তিনি উপাসনা করতেন সেইখানে তাঁর প্রিয় বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে। সেই বাণীতে উদ্‌ঘোষিত রয়েছে পরমেশ্বরের নাম,—যিনি প্রাণের আরাম, হৃদয়ের আনন্দ, আত্মার শান্তি।

যাঁরা মহর্ষির সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁরা আমাকে বলতেন যে মহর্ষির অপূর্ব মুখচ্ছবি ছিল তাঁর শান্ত সমাহিত অন্তরের প্রতিচ্ছবি। অনেকে এ-ও আমাকে বলেছেন যে বর্তমানে পরিণত বয়সে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকেও ঠিক তাঁর ঋষি পিতার মতোই দেখায়।

শান্তিনিকেতন পুণ্যাশ্রমের প্রান্তসীমায় তিনটি মাত্র অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম অনুশাসন এই যে,—এখানে মূর্তিপূজা বারণ। দ্বিতীয় অনুশাসন এই যে,—এখানকার পরিধির মধ্যে কোনো প্রকার জীবহত্যা বারণ। আর তৃতীয় এই যে এখানে ধর্মসম্পর্কিত কোনো প্রকার বিতর্ক চলবে না। এই তিনটি মাত্র বাধা ব্যতিরেকে শান্তি-নিকেতনে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর উন্মুক্ত আমন্ত্রণ।

প্রতি সপ্তাহে একদিন কবে অতি প্রত্যুষে কবি আশ্রমবালকদেব ধর্মোপদেশ দান কবেন। নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় তিনি ঈশ্বেব পুণ্য পিতৃত্বেব কথা বলেন। আশ্রমবাসীরা প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় ঈশ্ববোপাসনা করে। শৈশব থেকে এই সর্বমানবিক ধর্মশিক্ষা ও ধর্মাচরণ তারা লাভ কবে।

শান্তিনিকেতনের শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ের মধ্যে অতর্কিতে ভেঙে পড়ল ইউরোপের মহাযুদ্ধের সংবাদ। এই সংবাদ প্রচণ্ড ভূমিকম্পেব মতো আমার বহু স্বপ্নবাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ কবে দিল। স্বয়ং খৃষ্ট যে-দিনেব ভবিষ্য-বাণী কবেছিলেন,—আমার মনে হোলো সেই দিন যেন ঘনিয়ে এসেছে,—মহাবিচারের দিন। মানবপুত্রেব নব-অভ্যুত্থানের দিন।

ইংলণ্ডে আমার বৃদ্ধ পিতা ভাবলেন তাঁব এতোদিনেব আকাংক্ষিত ভবিষ্যৎ এবার বুঝি সফল হতে চলেছে। অশীতিপব তাঁব বযস,—দেহ অত্যন্ত দুর্বল। আমার ভগিনীদের কাছ থেকে আমি বেদনা-করুণ চিঠি পেতাম,—তারা লিখত আমার মা বর্তমান থাকতে আমাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা যেমন ছিল, পিতা সব কিছু ঠিক সেইমত বাখতে চাইতেন। মা-র অবর্তমানে কোনো পরিবর্তন তিনি সহ্য করতে পাবতেন না। আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবেব ধাবণা হোলো যে এইবার প্রভুব পুনরাবির্ভাবের সময় সমাগত,- তিনি এলেন বলে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা দীর্ঘ পত্রে

তিনি আমাকে জানালেন। মুক্তছন্দে লেখা একটি স্ববচিত কবিতাও পিতৃদেব এই সময়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতা ও তাঁব শেষ জীবনেব পত্রগুচ্ছ অতি মহার্ঘ সম্পদ বলে আমি সযত্নে বক্ষা কবে এসেছি। মহাযুদ্ধ শেষ হবাব পূর্বেই আমাব পিতৃদেব দেহরক্ষা কবেন।

মহাযুদ্ধ যখন পূর্ণভাবে ঘোষিত হোলো এবং এই যুদ্ধে আমাব স্বদেশ জড়িত হযে পড়ল তখন আমাব মনেব অবস্থা হোলো অতি অদ্ভুত। আমাব মনে জাগল নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা,--সন্দেহ আব অস্থিবতায মুহূর্তে মুহূর্তে বিপবীতমুখী চিন্তাব টানাটানি। আমি অবশ্য বুঝতে পাবছিলাম এমনি শিথিল অস্থিবতা বিপজ্জনক,—অবিলম্বে যদি কঠিন মনে সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতে না পাবি, তাহলে নিছক আবেগেব বন্যায ভেসে যেতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধকে আমাব অত্যন্ত সাধু ও মহান্ বলে ধাবণা হযেছিল। আমি দেখছিলাম বিন্দুতম প্রতিবাদ না কবে প্রতি দেশেব তরুণ সম্প্রদায় মৃত্যুব পথে অগ্রসব হচ্ছে,— যে উদ্দেশ্যকে ন্যায ও সত্য বলে মনে কবেছে,—সেই উদ্দেশ্যেব সফলতাব জন্যে জীবন ও জীবনেব চেয়েও মহার্ঘতব সব কিছুকে বিসর্জন দিতে মুহূর্তেব জন্য দ্বিধা কবছে না।

এই মহাযুদ্ধেব পবিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানবসমাজেব যে বিপুল নৈতিক পবীক্ষা উপস্থিত হযেছিল, সেই পবীক্ষা ববীন্দ্রনাথেব সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল অন্তবকে গভীবভাবে নাড়া দিযেছিল। এই বৎসবেব গোড়াব দিক থেকে আমি তাঁব সঙ্গে ছিলাম। মানবাত্মাব বেদনার্ত অন্ধকাব,— যে বেদনাব কোনো তল নেই, যে অন্ধকাবেব কোনো সীমা নেই, - সেই বেদনায মথিত হচ্ছিল কবিব মন, সেই অন্ধকাব গ্রাস কবছিল তাঁব হৃদয, —সর্বদা তিনি ভাবতেন সাবা পৃথিবীব মহা সর্বনাশ বুঝি দিনে দিনে ঘনিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ যখন বাধল,— পবম আশায তিনি বুক বাঁধলেন এই ভেবে যে প্রাচীন পৃথিবীব বণবিধ্বস্ত স্তূপভিত্তিব উপবে এক নবীনতব মহত্তব পৃথিবীব জন্ম হবে।

পৃথিবীর এই গভীরতম বেদনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মনেও সর্বপ্রথম আশার একটি আশ্বাস বেজেছিল। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে তাঁর দেরি হয়নি। এই যুদ্ধ সত্যের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে। মিথ্যা ও কলুষকামনার যে কোলাহলকে এই যুদ্ধ উৎক্ষিপ্ত করল, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও পাশব বর্বরতার যে নির্লজ্জতাকে দিকে দিকে প্রকাশ করল, তাতে কবি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যুদ্ধের সমস্ত আঘাত যেন তাঁর একলা অন্তরের গভীরে গিয়ে বাজল। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করলেন। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলতে লাগল,—যুদ্ধের প্রতি তাঁর ঘৃণাও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল।

মহাযুদ্ধের সূচনাকালে আমার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল সেই দ্বিধা আমার নৈতিক পরাজয়। উত্তেজনার সংক্রামক ব্যাধিতে সমস্ত পৃথিবী আক্রান্ত,—রণোন্মাদ তখন বন্যার মতো সর্বদেশের মানব-সমাজকে গ্রাস করছে। এই বিপুল তরঙ্গকে প্রতিহত করবার মতো শক্তি আমার ছিল না। যুদ্ধের উন্মাদনা আমার মনের মধ্যে মাথা উঁচু করেছিল, তাকে সংযত করতে আমি পারিনি। যুদ্ধের প্রত্যেকটি সংবাদ আমি তখন উদ্‌গ্রীব উৎসাহ নিয়ে অনুধাবন করতাম,—কেন না হিংসার বীজ আমার মনে তখন উপ্ত হয়েছে।

এই বীজ যখন তার ঘৃণ্য দানবীয়তা নিয়ে অচেতন থেকে চেতনার স্তরে এসে পৌঁছলো,—তখন আমার চমক ভাঙল। নিজেকে ঘৃণা করলাম,—নিজের মনের সঙ্গেই লড়াই সুরু হোলো আমার। কেন না,—যখনই আমি উত্তেজনাবিহীন শান্ত মুহূর্তে চিন্তা করেছি,—মনের শুভবোধ সর্বদা স্বীকার করেছে যে খৃষ্টনীতি যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে স্ফুলিঙ্গের অঙ্গে বাতাস দিয়ে দিয়ে যেমন সেই স্ফুলিঙ্গকে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত করা হয়, তেমনি শত্রুর প্রতি ঘৃণাকে লেলিহান ধ্বংসশিখায় পরিণত করা হচ্ছে মিথ্যার ঝটিকার সাহায্যে। সেই মিথ্যাকে চিনতে পেরে সাবধান হলাম আমি।

ক্রমে আমার আচ্ছন্ন চোখের মিথ্যা দৃষ্টি খসে পড়ল। মনের ঘোর কাটল। শান্ত অথচ আশংকাভরা মন নিয়ে আমি আমার ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করলাম,—আবো সযতনে ও আরো নিবিষ্টভাবে পড়তে লাগলাম প্রভুব বাণী।

প্রভু খৃষ্ট আমাকে পথ দেখালেন, আমি বুঝলাম যে ধর্ম ও যুদ্ধ এই দুই-এব মাঝে কোনো সন্ধি নেই। ঈশ্বর ও যক্ষ—এই দুই প্রভুর উপাসনা একসঙ্গে কবা যায় না।

যীশুখৃষ্ট সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা কবেছেন—

'তোমাব শত্রুকে তুমি প্রেম কবো;—যাবা তোমাকে অবজ্ঞা করে তাদেব তুমি মঙ্গল কবো, যাবা তোমাব প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহাব কবে, তাদেব জন্য তুমি প্রার্থনা কবো। তবেই তুমি তোমাব পবম-পিতাব উপযুক্ত সন্তান হতে পাববে।'

খৃষ্টেব এই ঘোষণাব কোন দ্ব্যর্থ নেই, কোনো দুর্বোধ্যতা নেই।

আমি বুঝলাম,—সঙ্গীন সমস্যা আমাব সম্মুখে। ঈশ্ববেব মহিমাকে নূতন কবে উপলব্ধি কবতে হবে আমাকে। কাকে আমি পূজা করব? কে আমাব ঈশ্বব? ওল্ড টেস্টামেন্টেব গোষ্ঠীদেবতা যিনি,—তিনিই কি আমাব ঈশ্বব? নিউ টেস্টামেন্টেব অন্তবদেবতা যিনি,— যাঁব মহিমাকে খৃষ্ট বিশ্বমানবেব অন্তবে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন, তিনিই কি আমাব ঈশ্বব? আমি দেখলাম,—বণোন্মাদনাকে মনেব মধ্যে বাসা দিয়ে আমি আমার পবম-প্রভু খৃষ্টেব প্রতি বিশ্বাসহন্তা হয়েছি। কিন্তু প্রভু আমাকে বক্ষা কবেছেন। তিনি তাঁব নিত্যবাণীব সম্মার্জনীঘাতে আমাব ক্লিন্ন মানসকে পবিচ্ছন্ন কবেছেন,—আবাব আমাকে ফিবিয়ে এনেছেন শুভ পথসীমানায়।

এই সময়ে ববীন্দ্রনাথেব কাছ থেকে আমি নিবিড়তম সাহায্য লাভ কবেছিলাম। তাঁব প্রতি আমাব শ্রদ্ধা ও প্রেম দিনে দিনে গভীর

থেকে গভীরতর হয়েছিল। তিনি তাঁর শান্ত বুদ্ধি দিয়ে আমার সংশয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা আমি অকপটে নিবেদন করতে পেরেছিলাম তাঁর কাছে। অখৃষ্টান হিন্দু হলেও রবীন্দ্রনাথ 'সার্মন অন্ দি মাউন্ট' পাঠ করেছিলেন ও এই উপদেশাবলীর গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন,— তোমরা খৃষ্টান হয়ে এ কী করছ? স্পষ্টতম নৈতিক নির্দেশ রয়েছে তোমাদের ধর্মে,-- সেই নির্দেশ তোমরা পালন করো না কেন?

অপর এক তৃতীয় সূত্র থেকেও আমি এই সংকটে সাহায্য লাভ করি। এই সূত্র গান্ধীজীর জীবনবেদ। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মহাত্মা গান্ধীর সাহচর্যে আমি দেখেছিলাম 'সার্মন অন্ দি মাউন্ট'-এর উপদেশাবলীর নিহিত অর্থ কর্মের মাধ্যমে কী ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। খৃষ্টানদের তিনি লজ্জা দিয়েছেন,—তাঁর উদাহরণ আমার চিত্তপটে অবিস্মরণীয়। সত্যই তাঁর শক্তি,—তাঁর 'সত্যাগ্রহ' খৃষ্টোপম অনুপ্রাণনা। এই যুদ্ধ সত্যাগ্রহের বিপরীত,—খৃষ্টকে যে অনুসরণ করে যুদ্ধ তার অমিত্র।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও আমার ধর্মগ্রন্থ এই তিন প্রভাব একটি অচঞ্চল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাকে পৌঁছে দিল। সংশয়ছায়াহীন সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে সত্যের আলোকে আমি দেখলাম যে, এই যুদ্ধ খৃষ্ট-নির্দেশের পরিপন্থী। আমি দৃঢ়নিশ্চয় হলাম যে, এই যুদ্ধ আমার নয়। যুদ্ধের কাজে যোগদানের জন্য যখন নির্দেশ এল, তখন আমি নির্ভীকচিত্তে অস্বীকার করলাম। এই অস্বীকারের অর্থ কারাবরণ। তার জন্যেও আমি সোৎসাহে প্রস্তুত হলাম। যদিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-পরিপন্থী বলে আমাকে শাস্তিভোগ করতে হয়নি, তবুও সমগ্র মহাযুদ্ধ-কালে মুহূর্তের জন্যেও আর কখনো আমার মনে আবিলতা আসেনি। বিশ্বাসই মুক্তি। এই বিশ্বাস আমাকে মহামুক্তি দিল। এই বিশ্বাসের জন্যে ভবিষ্যতে কখনো অনুতাপ করিনি।

এই মহাযুদ্ধ আমার জীবনে এক মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্যে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণায় আমার চিত্ত বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রণার মধ্যে আমার প্রভু খৃষ্টের প্রসাদ আমি লাভ করেছি,—নব নব স্বপ্ন-অগোচর রূপে তিনি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আপনাকে প্রতিভাত করেছেন। দুটি প্রতিজ্ঞা আমি করতে পেরেছিলাম,—প্রথম প্রতিজ্ঞা যে খৃষ্টান-গোষ্ঠীর কোনা গণ্ডীর মধ্যে আর কখনো থাকব না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধকে সমর্থন করব না। এই উভয় প্রতিজ্ঞাই আমার জীবনে সার্থক হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পব আমাব জীবনে যীশুর শক্তিকে আমি গভীরতরভাবে লাভ করেছি, তাঁব প্রসন্নতর মূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে।

এই সময়ে সুশীল রুদ্রের পুত্র সুধীর আমার কাছে এসেছিল। কিছুদিন আমার কাছে থাকাব পব অ্যাম্বুলেন্সের কাজ নিয়ে সে ফ্রান্সে যায়। সুধীব আমাকে বলেছিল,—সার, এখানে এই শান্তিনিকেতনে আপনি আছেন কী করে? এখানে তো 'হোলি কমিউনিয়ন' নেই?

আমি বলেছিলাম,—এই সব শিশুর দল, যাদেব আমি শিক্ষা দিচ্ছি, এরাই আমাব হোলি কমিউনিয়ন। আমি বলেছিলাম, ঈশ্বরের নামে শরণাগত তৃষ্ণার্তকে এক পাত্র জলদানই প্রকৃত হোলি কমিউনিয়ন,—তাই নয়?

আমার এই কথা সুধীর চিরদিন মনে রেখেছিল। ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে যখন তার পিতার শেষ রোগশয্যাপাশে,—আমিও তখন তার সঙ্গে ছিলাম। সুধীর তখন আমাকে বলেছিল,—

শান্তিনিকেতনের সেই সকালটিতে যে কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন সেই কথা ফ্রান্সে থাকতে আমাকে বারে বারে সাহায্য করেছে। ফ্রান্সে বিভিন্ন হাসপাতালে সৈনিকদের যখন আমি শুশ্রূষা

করতাম, তখন বুঝেছিলাম আপনার কথা কতো সত্য। এই সব রোগীদের দিকে তাকিয়ে আমিও বলতাম,—এরাই আমার হোলি কমিউনিয়ন। খৃষ্ট বলেছেন,—'আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করেছিলে।' খৃষ্টবাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য আপনার কথাতে আমি উপলব্ধি করেছি।

খৃষ্টের এই পরম বাণী আমার দৈনন্দিন জীবনে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য করেছে,—প্রেরণা দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে। কেন না প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আবদ্ধ শুধু মাত্র একটি নৈর্ব্যক্তিক মহা আদর্শ বলে আমি খৃষ্টকে দেখিনি। তাঁকে আমি জীবন্ত মানুষ বলে উপলব্ধি করেছি,—তাঁর পরমাত্মার সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমি সর্বদা অনুভব করেছি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যে নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছি,- তাঁর প্রত্যক্ষ বাণীর প্রসাদে শেষ পর্যন্ত আমি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। প্রভুর সেই বাণীর মধ্যে তাঁর অন্তরের গভীরতম বেদনা ও পরমতম আশ্বাসকে আমি অনুভব করেছিলাম। আমি যেন স্বকর্ণে শুনেছিলাম যে ধ্বংসের উন্মত্ত শোভা-যাত্রায় যোগদানের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে সাবধান করে বলছেন,—'আমার পশ্চাতে যে আসতে চায় সে যেন আপন সর্বসত্তাকে পরিহার করে আপন স্কন্ধে ক্রুসকে গ্রহণ করে একান্তভাবে শুধু আমাকেই অনুসরণ করে।'

এমনি সময়ে একটি নূতন চিন্তা আমার মনকে অধিকার করল। যুদ্ধের আগে আমি আফ্রিকায় গিয়ে আফ্রিকাবাসীদের প্রতি বর্ণ-বৈষম্যমূলক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছিলাম,—সেখানকাব ভারতীয় চুক্তিদাসদেরও আমি দেখেছিলাম। তখন এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় আমার চিত্তে সুস্পষ্ট হয়েছিল যে মানুষের এই অবমাননার বেদনা মানবপুত্র যীশুরই অন্তরবেদনা। এবার এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ দেখে আমি

স্থিরনিশ্চয় হলাম যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও শোষণনীতির পাপ এই যুদ্ধের মূল কারণ,—এবং পৃথিবীর অনুন্নত জাতিরাই এই পাপের প্রধান বলি। কিন্তু আমার প্রভু খৃষ্ট তাদেরই দলে। যারা অনুন্নত, যারা দুর্বল, ভাগ্য যাদের করুণ, তাদেরই দিকে তাঁর অনন্ত করুণা ধাবিত,--তাদেরই তিনি আহ্বান করে বলেছেন,—

'এসো তোমরা,--যারা শ্রান্ত যারা গুরুভার —আমাব কাছে তোমরা এসো,—আমি তোমাদের দেব বিশ্রাম।'

আমার মনের এই সব প্রবল চিন্তা আমি কবিব কাছে ব্যক্ত করলাম। আমার ভাবনাব সঙ্গে তাঁর ভাবনাব মিল দেখে আমার বড়ো আনন্দ হোলো। বর্ণ-বিদ্বেষ বা জাতীয় অহমিকাব সামান্যতম কালিমা তাঁর মনকে কখনো স্পর্শ কবেনি। অপবদিকে আবাব বৈজ্ঞানিক প্রগতিব জন্য পাশ্চাত্য জগতের প্রতি তাঁব গভীর অনুরক্তি ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতেব প্রতি অভিযোগও তাঁব মনে ছিল প্রবল। যে স্বাজাত্যগর্ব ও বাণিজ্যিক লালসার বলে পাশ্চাত্য জগত সাবা পৃথিবীকে গ্রাস কবতে চলেছে, তাকে তিনি ক্ষমা কবতে পাবেননি। মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে কবি বলতেন,—অনেক কিছু গ্রাস কবেছে ওবা, এবাব এসেছে মৃত্যুর বিষগ্রাস।

আমি কবিকে বলেছিলাম যে আমাব মনে হয় হয়তো এ মহাযুদ্ধ মানুষের বহু মালিন্যমোচনের মুক্তিস্নান। আমাব এ কথায় কবির মুখে যে বেদনার প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—

তোমার কথা সত্য হোক চার্লি,—এতে তোমাদেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। কিন্তু এই পাপের মূলে রয়েছে লোভ। মনের গভীর কন্দব থেকে এই লোভেব শিকড়কে যদি নির্মূল করা না যায়, তাহলে এই মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হবে—অর্থনৈতিক ক্ষতিকে পূর্ণ কববার, দরিদ্র অনুন্নতকে শোষণ কববার। এই লোভ আব এই শোষণস্পৃহাই

হোলো আসল ব্যাধি,—এই কাল-ব্যাধি যদি না সারে, তাহলে ব্যাধিব বাহ্যিক প্রতিক্রিয়াব চিকিৎসা করে লাভ কি ?'

'এসো তোমবা,—যাবা শ্রান্ত যাবা গুকভাব, - আমাব কাছে তোমবা এসো'—খৃষ্টেব কথাগুলি এ সময় নিবন্তব আমাব মনে প্রতিধ্বনিত হোতো। তাবপব ধীবে ধীবে আমাব মন এক পবম চৈতন্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল,—আমাব অন্তব প্রভুব কাছ থেকে এক পবম নির্দেশ লাভ কবল। তিনি আমাকে আহ্বান কবলেন আব এক যুদ্ধে। ইউবোপেব বিভিন্ন বণক্ষেত্র জুড়ে যে মহাযুদ্ধ চলেছে, তাব চেয়ে মহত্তব যুদ্ধেব সম্মুখীন হতে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। এ যুদ্ধ খৃষ্টেব নিজেব যুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবীব পদানত নিপীড়িত মানুষেব স্বপক্ষে অত্যাচাবেব বিকুদ্ধে হিংসাব বিকুদ্ধে ঘৃণাব বিকুদ্ধে তাঁব নিত্যকালেব যুদ্ধে তিনি আমাকে তাঁব সৈনিক কবে নিলেন। সৈনিক আমি হব না, সামবিক কাজ আমি কিছুতেই গ্রহণ কবব না, তাতে যে বিপদই আসুক—এই ছিল আমাব দৃঢ় সংকল্প। তবে এই সংকল্প ছিল নঙর্থক। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্তব্যেব আহ্বানে প্রভুব নির্দেশে আমি সত্যকাবেব সৈনিক হতে পাবলাম এবাব, বৃহত্তব ক্ষেত্রে বিবাটতম ধর্মযুদ্ধে আত্মনিবেদনেব নিঃসংকোচ আশ্বাস আমাব মনে জাগল।

এই আশ্বাসেব কথা আজ এখানে লিপিবদ্ধ কবা নিতান্ত সহজ। সেদিন কিন্তু এই আশ্বাসকে একনিষ্ঠ আস্থাব সঙ্গে আকড়ে বাখা মোটেও সহজ ছিল না। তখন সাবা পৃথিবী জুড়ে মহাযুদ্ধ চলেছে, পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিদিনেব জয় পরাজয়েব সংবাদে উত্তেজনাব তবঙ্গে মন সর্বদা আলোড়িত। এই আলোড়নেব হাত থেকে পবিত্রাণস্বরূপ কোনো প্রত্যক্ষ কর্তব্যেব সন্ধান কবা তখন সহজ ছিল না আমাব পক্ষে।

পৃথিবীর অন্যান্য বর্ণ ও জাতির প্রতি ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের ব্যবহার সম্পর্কে তখনো এটুকু আশা আমার মনে ছিল, যে ইংরেজ জাতি সাধারণের ব্যতিক্রম, ইংরেজ জাতির ব্যবহার মঙ্গল। এই জাতি যে আমারই জাতি, এই জাতির আদর্শ যে আমারই গৌরব। স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার পিতার মনে যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাস আমারও রক্তে পোষিত হয়েছিল। বিদেশে এসে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ সত্ত্বেও আমার মনের গভীর অন্তস্তল থেকে সে বিশ্বাসকে আমি মুছে ফেলতে পারিনি।

যে সময় দাসত্বপ্রথা বদ হয় ও বিখ্যাত রিফর্ম আইনগুলি পাশ হয়, ঠিক সেই সময়ে আমাব পিতৃদেবেব জন্ম হয়। স্বাধীনতাব প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও সমর্থ মানবতাবোধের ঐতিহ্য তিনি লাভ করেন তাঁর পূর্বপুরুষদেব কাছ থেকে। স্বাধীনতা ও মানবকল্যাণের আদর্শ আমাদেব ঈস্ট অ্যাংলিক্যান বক্তেব ধাবায় প্রবাহিত। এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশেব ঊনবিংশ শতাব্দীব চিন্তাধারার গভীর সংযোগ। বৃটিশ ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধ একটি স্মরণীয়কাল। ক্লার্কসন, উইলবারফোর্স, লিভিংষ্টোন, শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি, ফ্লোবেন্স নাইটিংগেল, জোসেফিন বাট্‌লাব প্রভৃতি মানবরত্ন যে দেশেব সন্তান, মানবকল্যাণ-ব্রতেব ইতিহাসে সে দেশেব অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

কিন্তু ১৮৮০ সাল নাগাদ আমাব স্বজাতির মানধারণায় এক বিচিত্র পরিবর্তনেব সূচনা হয়েছিল। আফ্রিকা ভূখণ্ডে ও অন্যত্র অন্যান্য ইউবোপীয় জাতিদেব সাম্রাজ্যলোলুপতার সঙ্গে সঙ্গে এই পবিবর্তনের শুরু। এই সঙ্গে খৃষ্টীয় নির্দেশেব পবিপন্থী বর্ণ-বিদ্বেষ ও জাতি-অহমিকা সারা পৃথিবীতে প্রকটতব হয়ে উঠল। শ্বেতকায় মানুষ সদম্ভে ঘোষণা করল যে সে-ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, তার জাতিই উচ্চতম জাতি। অন্য মানুষ অন্য জাতির সংস্পর্শ থেকে সে নিজেকে দূবে সরিয়ে নিতে লাগল। শুরু হোলো মানুষেব প্রতি মানুষের তিক্ত বিদ্বেষ।

বিদেশে ভ্রমণ করার ফলে আমি যে-সব দৃশ্য দেখেছি আমার পিতৃদেব তা দেখেন নি, আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। এই ঘৃণ্য বর্ণ-বিদ্বেষ বিশেষ করে পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলে কী লজ্জাকর বীভৎসতার সঙ্গে প্রকট হয়েছে, জাত্যাভিমানের নামে নির্লজ্জ কুণ্ঠাহীনতার সঙ্গে কতো সাংঘাতিক অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমি তা জানি। এও আমি জানি যে আমার প্রতিদিনের কর্ম ও চিন্তায় সতত যদি খৃষ্টের দৃষ্টি না থাকত তাহলে হয়তো স্বার্থপরতা ও বিজাতির প্রতি ঘৃণায় আমি অনেক শ্বেতকায়কেই ছাড়িয়ে যেতাম। আমি জানি, এই পাপের বীজ আমার মনের মধ্যেও ছিল,—প্রভু যীশুই আমাকে রক্ষা করেছেন।

এই সময়কার সমস্ত অন্তর্দাহের নিবৃত্তি হোলো অতর্কিতে। ১৯১৫ সালের মে মাস। আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটি হোলো। ছাত্র ও শিক্ষকেরা যে যার বাড়ি ফিরল। কয়েকটা দরকারী কাগজ সংগ্রহের জন্য কলকাতা থেকে আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হোলো আমাকে। হঠাৎ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অবিলম্বে প্রকট হোলো যে এশিয়াটিক কলেরার সাংঘাতিক কালব্যাধি আমাকে ধরেছে। কাছাকাছি কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক নেই যাকে সে রাত্রের মধ্যেই আনা যায়। সমস্ত রাত কাটল নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায়,—তবু আমার আচ্ছন্ন চৈতন্যে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল যীশুর বেদনাহত করুণাঘন মূর্তি।

কলকাতা থেকে কবি ছুটে এলেন শান্তিনিকেতনে। আমার রোগের সংবাদ পেয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব তিনি করেননি। পরদিন প্রভাতে কবির মুখ দেখে আমি যেন নবজীবন লাভ করলাম। তাঁকে যে আমি কতো ভালোবাসি তা আমি সেই মুহূর্তেই যেন সম্যক উপলব্ধি

করলাম। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমার ছিল,—কিন্তু এই ভালোবাসা শ্রদ্ধার চেয়ে অনেক গভীর, অনেক আন্তরিক।

কলেরা বোগ অত্যন্ত সংক্রামক। কবি এবং আমার অন্যান্য সুহৃদরা যাঁদের নিবন্তব সেবায় আমি পুনর্জীবন লাভ কবেছিলাম, তাঁবা নিজেরাই যে কোনো মুহূর্তে এই বোগে আক্রান্ত হতে পাবতেন। আপন প্রাণেব মমতা না কবে তাঁবা আমাব শুশ্রূষা কবেছিলেন,—আন্তরিক স্নেহভবে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিবিযে এনেছিলেন।

বেশ কিছুদিন পবে আমাকে কলকাতায এক নার্সিং হোমে স্থানান্তবিত কবা হোলো। তাবপব হৃতস্বাস্থ্যলাভেব আশায আমি গেলাম শিমলায়।

ফিজি দ্বীপ

শিমলা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করে দিনের পর দিন উষ্ণ রৌদ্রের আশ্রয়ে এক দীর্ঘ বারান্দায় আমি শুয়ে থাকতাম। শরীর এতো দুর্বল যে কিছু পড়তে পর্যন্ত ক্লান্তি আসত। সেই সময় চুক্তিদাসত্ববদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে একটি সরকারী বিবরণী আমার হাতে এল। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পরে এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার আগ্রহ স্বাভাবিক। বইটির পাতা উলটিয়ে দেখতে লাগলাম। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শ্রমিকদের আত্মহত্যার সংখ্যা ও বিবরণ দেখে আমি চমকে উঠলাম।

ফিজি দ্বীপ বহুদূরে,—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। সেখানেও বহু ভারতীয় শ্রমিকের বাস, বাগিচার চুক্তিদাসত্ব তাদের জীবিকা। রিপোর্ট পড়ে দেখলাম ভারতবর্ষে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা যতো, তার বহুগুণ বেশি এই ফিজি প্রবাসী ভারতীয় বাগিচা-শ্রমিকদের মধ্যে। এর কারণ গৃহগতপ্রাণ প্রবাসীদের দুঃসহ জীবনযাত্রা।

নাটাল ও অন্যত্র ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পাশাপাশি ফিজির ভারতীয়দের জীবনযাত্রার বিবরণ তুলনামূলক ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। ফিজির বিবরণ এতোই বীভৎস যে, আমি তা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। নাটালের চুক্তিদাসত্বপ্রথা আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। ফিজি দ্বীপের ভারতীয় শ্রমদাসদের জীবনযাত্রা যে কতো বীভৎসতর তা আমার মানস-চক্ষে স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি বইটি বন্ধ করলাম। বেশি পড়ার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু যেটুকু পড়েছি তার চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো মনে জেগে রইল।

কয়েকদিন পরের কথা। দুপুর বেলা আমি চোখ বুজে বারান্দায় শুয়ে আছি। হঠাৎ আমার বন্ধ দৃষ্টির সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য যেন ভেসে উঠল। নাটালের সেই দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকটিকে আমি যেন দেখলাম,—শ্বেতকায় মালিকের বেত্রদণ্ডের আঘাতে আঘাতে যার সমস্ত পিঠ ক্ষতবিক্ষত। সে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করুণ দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখে আমারও বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একটু পরেই আমার মানসচক্ষের সামনে তার মুখটি বদলে গেল। আমি দেখলাম মানবপালক পরম-প্রভু যীশুর মুখ,—যে মুখকে শিশুকাল থেকে আমি চিনেছি ও একান্ত করে ভালোবেসেছি। এই মুখচ্ছবি আমার মর্মমুকুরে এমনই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম,—সমস্ত প্রাণ আমি যেন সঁপে দিলাম অকুণ্ঠিত আত্মনিবেদনে।

ক্রমে দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলাম সেই নিঃসঙ্গ বারান্দায়। বহুক্ষণ পরে বুঝলাম আমি যা দেখছিলাম তা জাগ্রত স্বপ্ন,—মানুষের বেদনা-বঞ্চনার গভীর আবেগের ফলে আমার মগ্নচৈতন্য এই স্বপ্নের সৃষ্টি করেছে।

তবু আমার বিশ্বাস, সেদিন আমার প্রভু প্রকৃতই আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষকে উপলব্ধি করা আর অন্তর দিয়ে প্রকৃতকে অনুভব করা,—দুইই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা। মুখে যতোই আলাদা বলি না কেন, এই দুইয়ের মধ্যে অতি সংকীর্ণ সীমারেখা,—অনেক সময় এই রেখা কোথায় তা খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সেই উষ্ণ দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতো এই কথাটি আমার মনে উদ্ভাসিত হয়ে গেল যে খৃষ্ট আমাকে আহ্বান করেছেন ঐ সুদূর

সমুদ্রপারের ফিজি দ্বীপপুঞ্জে,—তাঁর আহ্বান ব্যর্থ হবেনা আমার জীবনে। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো দ্বিধা নেই,—খৃষ্ট-নির্দিষ্ট কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে।

ফিজি দ্বীপে যাত্রার চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল আমাব মন। কোন্ পথে যাব, যেতে কতোদিন লাগবে,—সেই সব খোঁজ খবব আমি নিতে শুরু করলাম। আমার জীবনেব এক নূতন অর্থ নূতন আশা আমি খুঁজে পেলাম, সেই সঙ্গে নবস্বাস্থ্যের স্পর্শ লাগল আমার দুর্বল দেহে। একটু সুস্থ হবাব সঙ্গে সঙ্গে কবিব কাছে আমাব উদ্দেশ্য নিবেদন কবলাম। কবি সানন্দে তাঁর আশ্রমেব কাজ থেকে আমাকে ছুটি দিলেন। পবম বন্ধু উইলি পিয়ার্সন আমাব সহযাত্রী হোলো, এতে অপরিসীম আনন্দ হোলো আমাব। কবিব উদাব হৃদয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে আমবা ভাবতবর্ষ থেকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করলাম।

ফিজিতে পৌঁছে আমরা দেখলাম বই-এ যা পড়েছিলাম সেখানকাব অবস্থা তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ। শ্রমদাসত্বেব নিগড়বদ্ধ ভাবতীয় নারীদেব অবস্থা. এতো দুঃসহ যে তা বর্ণনা কবা যায় না। নাটালে কুলি লাইনে নৈতিক অবনতিব যে কুৎসিত চিত্র দেখেছি এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। ববং ফিজিব ভাবতীয় শ্রমিকদেব মধ্যে নৈতিক কলংক গাঢতর। এমনি শ্রমচুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে হাজাব হাজাব দরিদ্র ভারতীয় সারা পৃথিবীব বিভিন্ন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে, —ফিজি, মরিশাস, নাটাল ও বৃটিশ গায়নায় অতিবাহিত কবছে বর্ণনাতীত দুঃখের জীবন। তাছাড়া ভারতবর্ষ থেকে আড়কাটিরা প্রতি বৎসর ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় শ্রমিককে দূর-দূরান্তে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! আমি দৃঢ়নিশ্চয় হলাম যে এমনি শ্রমিক-সংগ্রহকে পুরোপুরি রদ করা ছাড়া অন্য কোনো মধ্য পন্থা নেই।

উপনিবেশের কৃষি-মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বদলাবে এ আশা করা বৃথা। কিন্তু ভারতবর্ষেব জনমত এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই চুক্তি-দাসপ্রথার অবসানকে ভারতবাসীর প্রধান রাজনৈতিক দাবী বলে ঘোষণা কবেছেন। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত মহিলাবা তাঁদের সাগবপারের দুঃখিনী ভগিনীদের বেদনাকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ কবেছেন। ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমাব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব বিবরণ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জেব কাছে পেশ কবা হোলো। তিনি এই বিবরণীব যাথার্থ্যও স্বীকার কবলেন, ফলে চুক্তিদাসপ্রথাব অবসান ঘনিয়ে এল।

ফিজি থেকে ভাবতে প্রত্যাবর্তন কবে আমবা যে বিপোর্ট দিলাম তাব অব্যবহিত পবেই চুক্তিদাসপ্রথা বদেব আইন পাশ হোলো। ফিজিব বিভিন্ন বাগিচার দুর্নীতি ও অনাচাবেব যে সব তথ্য আমবা সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা এমনি প্রত্যক্ষ ও হৃদয়স্পর্শী যে ভাইসবয় সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডেব ভাবত-সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কিছুমাত্র বিলম্ব কবলেন না,—চুক্তিদাসপ্রথা বদ কবাব আইন যাতে যতো শীঘ্র সম্ভব পাশ হয় তার জন্যে তিনি তৎপব হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক দপ্তরেব অনুবোধে এই আইনে এমন একটি বিপত্তিকর বাক্য জুড়ে দেওয়া হোলো যাতে আমাদেব অনেক আশায় বাদ সাধল। আইনেব একটি ধারায় বলা হোলো যে এই প্রথাব প্রয়োজনীয় বদবদলেব জন্যে কিছু বিলম্ব ঘটবে।

চুক্তিদাসপ্রথা রদ হোলো,—এই আনন্দেব উচ্ছ্বাসে আমরা ঐ একটি ধাবা সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হইনি। কিন্তু এই ধাবাব ফলে সমস্ত ব্যাপাবটা এমনি জটিল হয়ে উঠল যে এক বৎসব যেতে না যেতে আবাব নূতন কবে কাজ শুরু করতে হোলো। আমরা অনুসন্ধান করে জানলাম যে ঐ বিলম্বকর ধাবাব সুযোগ নিয়ে লণ্ডনে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যাতে আরো পাঁচ বৎসর ধরে শ্রমিক সংগ্রহ করা

চলবে এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক নূতন প্রথায় শ্রমচুক্তির দাসত্বপ্রথাকে এক নূতন রূপে চালু করা হবে। এই প্রথার কলংক সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে, এখন নূতন চাতুরীর মাধ্যমে এই প্রথাকেই পুনর্জীবন দান করা হবে এ কল্পনা করাও অসম্ভব। অতএব আবার নূতন করে শুরু হোলো আমাদের সংগ্রাম।

ফিজি দ্বীপে প্রথম যাত্রা আমার এক অবিস্মরণীয় আনন্দ-অভিযান। আমার ভাগ্যবিধাতা প্রভুই আমাকে সেখানে আহ্বান কবে নিয়ে গিয়েছিলেন,—এই নির্দেশের জন্যে তাঁব প্রতি আমার অনন্ত ধন্যবাদ। আমার সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম এই ফিজি দ্বীপে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন যুগে শতাব্দী ও যোজন পাবেব দূরদূরান্তে খৃষ্টবিশ্বাসী নরনারীব মন খৃষ্টীয় সেবার আদর্শে কী স্বর্গীয় আবেগে বারে বারে অনুপ্রাণিত হয় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমি এখানে লক্ষ্য করেছিলাম,—লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছিল আমাব জীবন।

এখানে একজন মিশনাবী সাধুব সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর নাম মিষ্টার লেলীন। ফিজিবাসীদের তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ফিজিবাসী খৃষ্টান তরুণদেব এক হোলি কমিউনিয়ন উৎসবে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন। এই তরুণ খৃষ্টানদেব মধ্যে অনেকে কয়েক দিনের মধ্যেই সলোমন ও নিউ হেব্রাইডিস দ্বীপপুঞ্জেব বিভিন্ন দ্বীপে যাত্রা করবেন,—সেখানকাব অসভ্য অধিবাসীদেব মধ্যে প্রচার করবেন খৃষ্টীয় আদর্শ। খৃষ্টের প্রথম শিষ্যরা যেমন একত্র ভোজনের অনুষ্ঠানেব মধ্য দিয়ে খৃষ্টীয় প্রেরণাকে আপন আপন অন্তরে ভরে নিয়েছিলেন, তেমনি অনুপ্রেরণাকে আমরাও বরণ করে নিলাম এই ধর্মানুষ্ঠানে। একজন ফিজিয়ান খৃষ্টান একটি ধর্মগাথা রচনা করেছিলেন। স্থানীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সেই

গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হোলো। গানের প্রধান কলিটি নিম্নরূপ :

সুদূর সমুদ্রপার থেকে
কাব কণ্ঠ ভেসে ভেসে আসে ?
কে ডাকে নিরন্তর ?
সে ডাক বাজে আমার কানে,
সে ডাক বাজে তোমাবো প্রাণে,—
এসো, এসো, সমুদ্র পার হয়ে এসো,—
তোমাব হাত মিলাও আমার হাতে।

ফিজিবাসী খৃষ্টভক্তদের কণ্ঠে এই সঙ্গীতেব অনির্বচনীয় কারুণ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিজিবাসী কতো খৃষ্টান প্রচারক স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্রপাবেব দূব দ্বীপে গেছে, এই অভিযাত্রীদের মধ্যে কতোজন প্রাণ বিসর্জন কবেছে দুর্গম প্রবাসে। তাদেব স্মৃতি নিষুপ্ত রয়েছে এই সঙ্গীতেব মধ্যে। এই সঙ্গীতেব বেদনা যে সব স্থানীয় খৃষ্টান অধিবাসীদেব কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, তাদেবই নিকটতম পূর্বপুরুষ ছিল অসভ্য বর্বব। আজ তাবা বর্বরতাব বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় অভিযানে জীবনোৎসর্গ কবতে চলেছে। তাদেব কানে তাদেব প্রাণে দূব-দূবান্তেব ডাক এসে পৌঁছেছে। সে ডাক মানুষেব প্রতি মানুষের ডাক,—সাহায্য কবো, সেবা কবো, হাত মিলাও হাতে।

ধর্মানুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। আমি এক দোভাষীর সাহায্য নিয়ে এই সব তরুণ ফিজিয়ান খৃষ্টান প্রচাবকদেব প্রতি আমাব পরিপূর্ণ অন্তরেব প্রেম ও শুভকামনা জ্ঞাপন করলাম। বিদেশী তরুণ বন্ধুরা আমার কাছে ঘিরে এল, -হাতের মুঠিব মধ্যে ভরে নিল আমার হাত।

এমনি আশ্চর্য মুহূর্তে আমার জীবনে আরো এসেছে। এমনি মুহূর্তে প্রতিবার এই কথাই আমার প্রাণে বেজেছে যে খৃষ্টের সর্বমানবিক

প্রেমের প্রসন্ন আলোক-আঘাতে ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ-গড়া সমস্ত বাধা-নিষেধের ছায়া-যবনিকা দূর হয়ে যায়। আমি যখন নিজে হাই চার্চের অন্তর্গত ছিলাম তখন আমি নিজেও ধারণা করতাম যে অ্যাংলিকান খৃষ্টানগোষ্ঠী ও অন্যান্য খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ তা বুঝি ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু এই ধারণা যে অসত্য তার কতো সহজ প্রমাণ খৃষ্টই দিয়ে গিয়েছেন! রবিবার দিন যে 'স্যাবাথের' দিন,—এও তো ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু খৃষ্টই আবার সমস্ত বিধান থেকে মানব-মনকে মুক্তি দিয়ে গেছেন,—যখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানুষই রবিবারেব বিশ্রামকে সৃষ্টি করেছে, রবিবার মানুষকে সৃষ্টি করেনি,—মঙ্গলকর্ম যদি করতে হয় তার জন্যে রবিবারই বা কি আর অন্য বারই বা কি! একজন ইংরেজ বিশপ একদা বলেছিলেন,—সমস্ত বিধানেব উপরে মঙ্গলবিধান। খৃষ্টের বাণীই তিনি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।

আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের প্রেম ব্যাপকতম উদারতম। যীশুখৃষ্টের বাণী যদি সত্য হয়, এবং ঈশ্বর যদি প্রকৃত আমাদের সকলের পিতা হন, তাহলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আমার ভাই,—কেন না প্রতিটি মানুষ আমার পরম-পিতারই সন্তান। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরূপে আমাদের কর্তব্য-সর্ব দেশের সর্ব জাতির মানবকে আপন বলে গ্রহণ করা,—ঈশ্বরের অখণ্ড প্রেমেব শক্তিতে আপন অন্তরের প্রেমকে সর্ব-মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করা।

যীশুখৃষ্ট আমাদের সংস্কারের বন্ধনে বাঁধেন নি। বিশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশে তিনি আমাদের মহামুক্তির আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছেন। জাতিধর্মের ভেদাভেদ যদি বর্জন করে সারা বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করতে পারি, তবেই প্রভুর সেই মুক্তির আশীর্বাদকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারব। এবং সেই সঙ্গে এক মহা মহৎ অভিজ্ঞতাও আমরা লাভ করব। খৃষ্টান নামে অভিহিত নয় এমন অনেক মানুষের হৃদয়ে খৃষ্টীয় আদর্শের ফল্গুধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। তারপর

শেষ বিচারের দিন যখন আসবে সেদিন লক্ষ্য করব যে সেই সব অখৃষ্টানরাই ঈশ্বর-চরণে স্থান পেয়েছে,—যারা মুখে খৃষ্টের নাম নেয় অথচ জীবনে খৃষ্ট-আদর্শকে সম্মান দেয়নি, ঈশ্বব তাদের ঠিকই চিনেছেন,—আপন পাদপ্রান্ত থেকে অনেক দূবে সরিয়ে রেখেছেন তাদের।

ভাবতীয় শ্রমিকদেব চুক্তিদাসপ্রথাব সম্পূর্ণ অবসানেব উদ্দেশ্যে আমাদেব শেষ আন্দোলনেব কাহিনী সংক্ষেপে এই পবিচ্ছেদেব শেষে বিবৃত কবা যাক।

পূর্বেই বলেছি যে একই কু-প্রথাকে নূতন নামেব সজ্জা পবিয়ে পুনরুজ্জীবিত কবাব প্রচেষ্টা আমবা লক্ষ্য কবেছিলাম। ভাবতীয় নেতাবা আমাকে অনুবোধ কবলেন পুনবায় ফিজি দ্বীপে যেতে। সেখানকাব প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকতবভাবে আমাকে তথ্য সংগ্রহ কবে আনতে হবে। যে অভিশাপ অবর্ণনীয় নৈতিক কলংকেব সৃষ্টি কবেছে এবং যাব ফলে ভাবত ও বৃটেনেব মধ্যে প্রচুব তিক্ততাব সৃষ্টি হয়েছে সেই অভিশাপ যেন আবাব নূতন কবে মাথা তুলতে না পাবে, তাব দায়িত্ব নিয়ে আমি আবাব সমুদ্রযাত্রা কবলাম।

প্রথমবাব আমাব সঙ্গে উইলি পিয়ার্সন ছিল। এই দ্বিতীয়বাবের ফিজিযাত্রায় আমি সম্পূর্ণ একা। এবাব প্রায় এক বৎসব আমি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগব অঞ্চলে ছিলাম। এইবাবে প্রায়ই শাবীবিক অসুস্থতার কষ্ট যেমন ভোগ কবি তেমনি ভোগ কবি স্থানীয় স্বার্থ-শত্রুতার কঠিনতব আঘাত। প্রথমবাব ফিজিতে গিয়ে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তাব কণামাত্রও এবাব পাইনি। নিঃসঙ্গতা আব অবসাদে সর্বদা আমাব অন্তব ভবে ছিল। তবে প্রথমবাবেব চেয়ে এবার আমি কাজ কবতে পেবেছিলাম অনেক বেশি। এবাব আমি যা তথ্য সংগ্রহ কবে আনলাম তা এমনই ব্যাপক ও এমনই

গভীর যে এই শ্রমদাসপ্রথার স্বপক্ষে কোনো যুক্তির আর স্থান রইল না।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আমাব এই দ্বিতীয় যাত্রার শুভস্মৃতি আছে বৈ কি। ফিজি-প্রবাসিনী ভাবতীয় শ্রমিকনাবীদেব পক্ষ নিয়ে অস্ট্রেলিয়াব নারীসমাজ যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তা ভুলবাব নয়। আমি এবাব অস্ট্রেলিয়াব বিভিন্ন শহবে গিয়ে বিভিন্ন মহিলা-সভায় শ্রমচক্তিবদ্ধ ভাবতীয় নাবীদের দুঃখ-দৈন্যের কথা শুনিয়েছিলাম,—কেমন মিথ্যা ছলচাতুবীব সুযোগে তাদেব ভুলিয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানকাব বাগিচায় কী বীভৎস ঘৃণ্য জীবন-যাপনে তাদেব বাধ্য কবা হয়। আমি শুনিয়েছিলাম কী জঘন্য দুর্নীতিব পংকে এই ভাগ্যহাবা শ্রমিকনাবীদেব জীবন নিমজ্জিত,—তাব ফলে কতো খুনোখুনি, কতো আত্মহত্যা, সুস্থ ভদ্র সংসাবযাত্রাব কী ভয়ংকব পবিণাম!

আমাব কথা প্রথম প্রথম অস্ট্রেলিয়াবাসিনীবা বিশ্বাসই কবেননি। তাঁদেব নিজস্ব প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণেব জন্যে তাঁবা মিসেস্ গার্নহাম নাম্নী এক মহিলাকে ফিজিতে প্রেবণ কবলেন। মিসেস্ গার্নহাম যে বিপোর্ট আনলেন তাব চিত্র আমাব বর্ণনাব চেযেও অনেক ভয়াবহ!

অস্ট্রেলিয়াব নাবীসমাজ এই রিপোর্ট পেয়ে তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন,—তাঁরা সমস্বরে দাবী কবলেন যে এমনিভাবে বিদেশী শ্রমিক সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ কবে দিতে হবে। মিস্ প্রীস্ট ও মিস্ ডিকসন নামে দুই অস্ট্রেলিয়ান মহিলা তৎক্ষণাৎ ফিজি যাত্রা কবলেন। এই দুই মহিলা থিয়োজফিক্যাল সোসাইটিব সদস্যা ছিলেন। তাঁবা ফিজিতে গিয়ে ভাবতীয় শ্রমিকনারীদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করলেন। ভারতবর্ষে শ্রীমতী জয়জী পেটিটের নেতৃত্বে একদল মহিলা বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি

আদায় করলেন যে, অবিলম্বে শ্রমচুক্তিপ্রথা রদ করার জন্যে যা কিছু দবকার তা কবা হবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালেব ১লা জানুয়াবী তাবিখে এই ঘৃণিত প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হোলো। ভাবতীয় পুরুষ ও নাবী যাবা সেদিন পর্যন্ত শ্রমচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল সেদিন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল তারা। সমস্ত উপনিবেশে এই দিনটি মুক্তিদিবস নামে স্মবণীয়। ভাবতবর্ষের ইতিহাসেও এই দিনটিব অম্লান আনন্দ-ভাতি।

সম্প্রতি ফিজি-প্রত্যাগত কযেকজনেব সঙ্গে আমাব লণ্ডনে সাক্ষাৎ হযেছে। তাঁদেব কথা শুনে আমাব স্পষ্ট ধাবণা হযেছে যে, সত্যই অল্প সমযেব মধ্যে ফিজিতে অনেক সুফল ফলেছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয, নৈতিক ও শিক্ষামূলক কল্যাণক্ষেত্রেও। শ্রমিকদেব স্বাধীনতাব প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পুবাতন কুলি লাইনেব দুর্নীতি-মূলক জীবনযাত্রাব অবসান হযেছে, সামাজিক জীবনে সুস্থতব ও আনন্দকব পবিবেশেব সৃষ্টি হযেছে, নব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হযেছে নবস্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ভাবতীয কর্মীব নূতন সংসাব।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আমাব এই শেষ যাত্রায আমাব প্রধান পাথেয ছিল ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব প্রীতি ও প্রেবণা। নিঃসঙ্গতাব ছায়ায, শত্রুতার পংকে ও হতাশাব অন্ধকাবে যখনই আমাব মন ডুবে গেছে, তখনই আমাব মানসচক্ষে আমি শান্তিনিকেতনেব প্রশান্ত পবিবেশকে কল্পনা কবেছি,—যেখানে প্রতিদিন প্রত্যূষ-আভাব বহু পূর্ব থেকে ববীন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন স্তব্ধতায উপবেশন কবে আছেন। আমাব উত্যক্ত অবসন্ন মন এই স্মৃতিচিত্র থেকে অশেষ সান্ত্বনা লাভ কবত। ববীন্দ্রনাথেব পত্রাবলী থেকেও আমি গভীব অনুপ্রেবণা লাভ কবতাম। সমুদ্রপাবেব সেই সুদূব দ্বীপে তাঁব একটি চিঠি যেদিন আসত, সেই দিনটিকে জীবনেব আশীর্বাদরূপে আমি গ্রহণ কবতাম।

ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহে এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে এমনি ভাবে মানুষের কাছ থেকে যে প্রেম যে স্নেহ আমি লাভ করেছি, তুলনাতীত তার ঐশ্বর্য। আমি এ-ও জানি,—মানুষের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে মানুষের ভালবাসাকে আপন মঙ্গলক্রোড়ে স্থান দিয়ে আমার সমগ্র জীবনকে ঘিরে রয়েছে ঈশ্বরেব ভালোবাসা,—আমার পরম-পিতার পরম প্রেম।

সেই প্রেম তার নিত্য অঙ্গুলি-নির্দেশে আমাকে সেই চিরন্তন অনন্ত সত্যের পথে পরিচালিত করে চলেছে। এই সত্যের আলোকে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভাসিত, সর্ব অন্ধকারেব নিবৃত্তি। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— এই মন্ত্রোচ্চারণেব মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথও এই অনন্ত অখণ্ড সত্যের পথে আমাকে আকর্ষিত করেছেন। আমাব মবদৃষ্টি এই পবম সত্যকে যীশুখৃষ্টের পরমরূপেব মধ্যে দর্শন কবে ধন্য হয়েছে।

চীন ও জাপান

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে ও উইলি পিয়ার্সনকে নিয়ে জাপান যাত্রা করলেন। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমি কবির সঙ্গে এই প্রবাসযাত্রায় যোগ দিলাম। চীন ও জাপান—এই দুই দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার উদার প্রবাহ, -এই দুই দেশ দেখার আগ্রহ আমি অনেকদিন থেকেই মনে পোষণ করে আসছিলাম। এই দুই দেশেব জীবনাদর্শ ও ধ্যানধারণার অতি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। কোনো প্রতীচ্য দেশবাসী যদি মানব-সভ্যতার বিবর্তনকে অনুধাবন করতে চান তাহলে এই দুই প্রাচ্য দেশকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ কবতে হবে। তাছাড়া আমার আগ্রহের আবো কাবণ ছিল। বহু প্রাচীন কাল থেকে চীন ও জাপান বৌদ্ধ-ধর্মেব একনিষ্ঠ অনুগামী, এবং এই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকেই চীন জাপানে প্রচারিত হয়েছিল। জাপানী লেখক ওকাকুরার কাছ থেকে এই দূরপ্রাচ্য-সংস্কৃতিব অনেক শিক্ষা আমি লাভ করেছিলাম। ভারত ও চীন-জাপানেব সাংস্কৃতিক মৈত্রীব যোগসূত্র আমি লক্ষ্য করব,—এই ছিল আমার প্রধান অভিলাষ।

প্রাচ্য জগতেব বৌদ্ধ সভ্যতা ও প্রতীচ্য জগতে খৃষ্টান সভ্যতা নিয়ে গত কয়েক বৎসব ধরে আমি পড়াশুনা ও চিন্তা করছিলাম। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানবজাতির ইতিহাস ও বিকাশ এক সুসমঞ্জস অগ্রগতি-পথে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মমতেব ঊর্ধ্বে মানব-ধর্মের গভীরে এক মৌলিক ঐক্য বর্তমান,—এ-ও সত্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে আমি ভারতের সেই মহান্ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম,—যার নাম অহিংসা। এই আদর্শ বুদ্ধেব পরম বাণী।

ভারতের অহিংসাধর্ম ও খৃষ্টের প্রেমধর্মেব মধ্যে মৌলিক বন্ধনকে আমি দিনে দিনে উপলব্ধি কবেছিলাম। আমাব কেবল মনে হোতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব ধর্মবোধেব এই মানবিক ঐক্যকে যদি অন্তব দিযে মানুষ বিশ্বাস কবে তাহলেই অন্তব-মন্দিবে জীবনদেবতাব প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়,—তাহলেই ভবিষ্যৎ মানবসমাজ দ্বেষবিভেদবিহীন এক মহান ঐতিহ্যেব ভিত্তি স্থাপিত করতে পাবে।

জাতিগত ভাবে জাপানীদেব সম্মানবোধ বীবত্ব ও নৈতিক শক্তিব কথাও আমি অনেক শুনেছিলাম। ফলে আমাব দৃঢ বিশ্বাস ছিল যে, ভাবতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত কবিকে জাপানীবা মন-প্রাণ দিযে বুঝতে পাববে, অকুণ্ঠ হৃদযাবেগেব সঙ্গে অভ্যর্থনা কববে।

ভবিষ্যতে দূব প্রাচ্যে আবো কযেকবাব ভ্রমণেব পব আমি দেখেছি যে আমাব ধাবণা সত্য। কিন্তু কবি যখন এই প্রথমবাব দূব প্রাচ্যে গেলেন, তখন নিতান্ত প্রতিকূল সমযেই তিনি গেলেন। বণোন্মাদমাব তাপ তখন শিখবে উঠেছে। যে সব কাবণে পাশ্চাত্য সমাজেব ভিত্তি-মূল পর্যন্ত বিনষ্ট হতে বসেছে, সেই সমস্ত কাবণকে জাপান তখন অন্ধ আবেগে অনুকবণ করছে।

কবি ও উইলি পিযার্সনেব সঙ্গে একদিন আমি কোবে শহবে এক শিশু-বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। ছোট ছোট শিশুবা ইউনিফর্ম পবে মিলিটারি ড্রিল কবছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা আমাব বেশ কৌতুককব লাগল। কিন্তু কবিব গভীবতব হৃদযানুভূতিতে প্রচণ্ড বেদনা বাজল এই দৃশ্যে। যুদ্ধেব উত্তেজনায শিশুচিত্তকে কী ভাবে কলুষিত কবা হচ্ছে তা তিনি আমাদেব বুঝিয়ে দিলেন। শত্রুবিজয়েব নানা নিদর্শন বিদ্যালয়ে দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো রযেছে,—সেইগুলির প্রতি কবি আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জাপানেব প্রতিটি শহব তখন কঠোর যুদ্ধপ্রস্তুতিব কর্কশ নির্ঘোষে

ধ্বনিত হচ্ছে। সৈন্যবাহিনী করছে অবিরাম কুচকাওয়াজ। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রতিদিন ছড়াচ্ছে মুঠো মুঠো মুঠো জঙ্গী উত্তেজনা। দেশের সমস্ত আবহাওয়া যুদ্ধের দূষিত বাষ্পে ভরপুর। কবির সঙ্গে প্রধান প্রধান জাপানী নাগরিকরা সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের এ নিয়ে কথা হোলো। উত্তরে তাঁরা বললেন যে এই রণোন্মাদনা অত্যন্ত দুঃখকর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। পাশ্চাত্য জগতের রণপ্রস্তুতি যতোদিন বর্ধিত থেকে বর্ধিততর হবে ততোদিন প্রাচ্যের প্রতিটি দেশের পক্ষেও এই একই পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া রক্ষা নেই।

ওদেশে কিছুদিন কাটাবার পরই অবশ্য আমরা বুঝতে পারলাম যে জাপানের সে সময়কার বাহ্যিক রূপটা যতো কুৎসিতই দেখাক না কেন, এই কদর্যতা বেশিদূর গভীরে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি, বিনষ্ট করতে পারেনি জাপানের জাতীয় আত্মাকে। জাতীয় সভ্যতার নিহিত প্রাণকেন্দ্র ঠিকই আছে,—অপরিবর্তিত অম্লান।

একটি গভীর হৃদয়স্পর্শী ঘটনা উল্লেখ করি। জাপানের পার্বত্য অঞ্চলে আমরা ভ্রমণ করছিলাম। রেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি ক্ষুদ্র অখ্যাত স্টেশনে আমাদের গাড়ি থামল। দেখি একদল বৌদ্ধ পুরোহিত সেখানে অপেক্ষা করছেন,—পরণে তাঁদের ধর্মীয় পোশাক। কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে উপহার হাতে তাঁরা এগিয়ে এলেন।

কারুণ্য-বেদনার বলিরেখায় পুরোহিতদের মুখমণ্ডল আকীর্ণ। করুণাঘন প্রভু বুদ্ধের প্রেমফল্গু তাঁদের অন্তরে প্রবহমান,—বিশ্বের বেদনা-বঞ্চনার ভারে মন্থর তাঁদের হৃদয়। এই বৌদ্ধ সাধুদের সৌম্য মণ্ডলীকে ঘিরে দাঁড়াল জঙ্গী পোশাকপরা জাপানী সামরিক কর্মচারীর দল। এদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন কবি—অন্য জগতের এক আশ্চর্য মহাপুরুষ। মুখে তাঁর করুণার প্রেমের ও সহানুভূতির

এক অপূর্ব অনুপম দিব্যভাতি। বৌদ্ধ সাধুদের শান্ত ছায়াঘন মুখের বিনম্র শ্রদ্ধা কবির মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল গৌরবের আশীর্বাদে আনন্দ-উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এইখানে—জাপানের অজ্ঞাত পথপ্রান্তের এই অখ্যাত স্টেশনে—যে দৃশ্য আমি দেখলাম, তাতে আমার মনে হোলো,—আমার পরমকারুণিক প্রভু খৃষ্টের উপস্থিতিকেই যেন আমি অনুভব করছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অহিংস সত্যাগ্রহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক এমনি ভাবেই খৃষ্টের উপস্থিতিকে আমি অনুভব করেছিলাম। দুই অনুভূতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্বমানবের বেদনার আসনে আমার প্রভুর স্থান।

ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে কবি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতামালা প্রসঙ্গে জাপানী সংবাদপত্র এমনই এক দায়িত্বহীন উক্তি করল যে কবির অবস্থানকালেই জাপানী জঙ্গীবাদ প্রবলতম আকার ধারণ করল। কবি তাঁব বক্তৃতায় জাপানের বর্তমান আক্রমণাত্মক উত্তেজনাকে ধিক্কার দিলেন—বললেন,—এর ফলে জাপানের প্রকৃত সভ্যতাব সৌন্দর্য নষ্ট হতে চলেছে। সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে এমনি মন্তব্য কবিব পক্ষে অত্যন্ত সাহসের কাজ হয়েছিল। সত্যভাষণের অদম্য সাহস ছিল কবির মনে। কবির এই সমালোচনাব বিরুদ্ধে উষ্ণ প্রতিবাদধ্বনি হতে কালবিলম্ব ঘটল না। জাপানী সংবাদপত্র দেশবাসীকে এই বলে সাবধান করে দিল যে কবি 'পরাজিত জাতির গুরু'—তাঁব কথা যেন কেউ না শোনে,—যদি শোনে তাহলে ভারতবর্ষ যেমন বিদেশীর যুপকাষ্ঠে নিজের স্বাধীনতাকে বলি দিয়েছে, জাপানেরও সেই দশা হবে।

জাপানী জাতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ নিয়ে কবি এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। যে প্রেমের অমৃতবাণী দিয়ে ঈশ্বর কবির অন্তর

ভরে দিয়েছিলেন,—সেই বাণীই তিনি ঘোষণা করতে এসেছিলেন জাপানে। সেই সঙ্গে জাপানবাসীদের কাছ থেকে তিনি নূতন করে শিখতে এসেছিলেন বুদ্ধের বিশ্বজনীন অহিংসামন্ত্র। তাঁর আগমনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি জাপানবাসীদের কাছ থেকে অতুলনীয় অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। একমাত্র টোকিয়ো স্টেশনেই তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য আড়াই লক্ষ জন সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকাশ পেল যে তিনি বর্ণবৈরিতা ও উগ্র জাতীয়তাব পরিপন্থী,—যুদ্ধ তাঁর কাছে ঘৃণ্য,—তখন তাঁর বাণীর বিরুদ্ধে জাপানী সংবাদপত্র কুৎসা প্রচার আরম্ভ করল। কয়েক দিন যেতে না যেতেই আমরা দেখলাম,—মাত্র ক-দিন পূর্বে যে দেশের লোকে উন্মাদ আগ্রহে তাঁকে বরণ করেছে, সেখানে ক-দিন পরেই তিনি বন্ধুপরিহৃত, নিঃসঙ্গ।

জাপানী যুদ্ধবাদীরা তাঁর স্বদেশকে বলেছিল পরাজিত দেশ। এই নিন্দা তাঁর কোমল অন্তরে গভীর ভাবে আঘাত হেনেছিল। কিন্তু এই আঘাতকে কবি অচিরে জয় করলেন,-পরাজয়কে গৌরবান্বিত করলেন তিনি,—তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হোলো পরাজিতের গান—

My Master has bid me,
while I stand at the roadside,
to sing the song of Defeat,
for that is the Bride whom He woos
in secret ;
She has put on the dark veil,
hiding her face from the crowd,
but the jewel glows on her breast
in the dark ;
She is silent, with her eyes downcast ;
she has left her home behind her ;

from her home has come
that wailing in the wind.
But the stars are singing
the love-song of the eternal
to a face
sweet with shame and suffering.
The door has opened in the lonely chamber,
the call has sounded,
and the heart of the darkness
throbs with awe
because of the coming tryst.

(Song of the defeated)

কবি গাইলেন,—

প্রভু, পথপাশে দাঁড়িয়ে তারই গান আমি গাই, যে পরাজিতা, যে অবমানিতা,—যে তোমার গোপন প্রণয়িনী। ভাষাহারা নতনয়না সে, গৃহবঞ্চিতা সে,—বাতাসের ঐ দীর্ঘশ্বাসে বুঝি তারই পরবাসিনী বেদনা আঁকা। সকল চোখের অন্তরালবর্তিনী, কৃষ্ণাবগুণ্ঠিনী সে,—তবু দেখি অসিত অন্ধকারে তারই মর্মমাঝে তোমার পরশমণি জ্বলে। তোমার আকাশের অগণ্য গ্রহতারা তারই কানে তোমার অনন্ত প্রেমগীতি গায়,—বলে, তোলো তোমার লজ্জাঘেরা যন্ত্রণাভরা মুখ। এসেছে আহ্বান, খুলেছে নিভৃত মিলনের বাসরদ্বার ;—তোমার পদধ্বনি গণি গণি গুরুগুরু নীরন্ধ্র ক্রন্দসী।

কবির সেই মুহূর্তের নিদারুণ অন্তর্বেদনা আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আর একটি 'পরাজিত জাতির' কথা আমার মনে পড়েছিল। সেই পরাজিত জাতির ক্রোড়েই জন্মলাভ করেছিলেন আমার প্রভু যীশুখৃষ্ট। কত মানুষের কতো অবজ্ঞা তিনি সহ্য করেছিলেন,—কতো দুঃখের

ধারা কতো অপমানের কালিমা বর্ষিত হয়েছিল তাঁর উদার ললাটে!

আর একবার সমুদ্রযাত্রা করলেন কবি। এবার যাত্রা চীনদেশে। কবির এই ভ্রমণেও কিছুদূব পর্যন্ত তাঁব সঙ্গে থাকায় সৌভাগ্য আমাব হয়েছিল। পিকিন শহবে উপস্থিত হয়ে কবি অকুণ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে গভীব সাবধানবাণী উচ্চাবণ কবলেন প্রতীচ্যেব বস্তুতান্ত্রিক জযোন্মাদনাব বিরুদ্ধে। চীনা ছাত্রদেব সভায় তিনি বললেন,—

পাশ্চাত্য দেশ তোমাদেব শিখিয়েছে পাশব শক্তিব উপবে আব কিছুই নেই। বলো তোমবা,—বুকে হাত দিয়ে বলো,—এই সত্যই কি চরম সত্য? বহু শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন ভাবতে এক মহৎ ঋষি ঘোষণা কবেছিলেন—অন্যায়েব দ্বাবা মানুষ তাব বাসনাব বিলাস তাব মাৎসর্যেব পবিতৃপ্তি লাভ কবতে পাবে, কিন্তু তাব আত্মাব মর্মমূল তাতে বিশুষ্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। বস্তুতান্ত্রিক ক্ষমতাব শিখবে নৈতিক সত্যকে স্থান দেযনি বলে পৃথিবীব কতো প্রাচীন সভ্যতা বিস্মৃতিব অন্ধকাবে লুপ্ত হয়েছে। সেই অবলুপ্তিব বিপদেব সম্মুখে আজ প্রতীচ্য পৃথিবীব আধুনিক সভ্যতা। এই প্রতীচ্যেব ধর্মগুরুই কি প্রশ্ন কবেননি—'মানুষ যদি সমস্ত পৃথিবীকে জয় কবে ও তাব বিনিময়ে আপন আত্মাকে হাবায় তাহলে কী তাব লাভ? এমন কী কাংক্ষিত সম্পদ আছে যাব বিনিময়ে মানুষ আপন আত্মাকে বিলিয়ে দিতে পাবে?'

সে সময়ে চীনদেশের জনসাধাবণেব মনেও উত্তেজনাব অভাব নেই। সেই পবিস্থিতিতে কবি যে ভাবে যে সুস্পষ্ট দৃঢ়তাব সঙ্গে তাঁব অন্তরেব সত্যকে চীনাজাতিব সামনে ঘোষণা কবেছিলেন তা কেবল তাঁরই মতো মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব। যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি ও যে সত্যদর্শনের ফলে এ যুগেব ঘনায়মান সভ্যতার সংকটের বিরুদ্ধে

তীব্রতম বাণী উচ্চারণ করা যায়, তার একমাত্র অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপানের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়-মাধুর্যে ও নৈতিক মহত্ত্বে এই দুই প্রাচ্যদেশ অভিভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখনই তিনি আবার এই দুই দেশে গেছেন, প্রকৃত সত্যদ্রষ্টারূপে তিনি সম্মানিত হয়েছেন,—সশ্রদ্ধ সৌজন্যের সঙ্গে দেশবাসী তাঁর কথা শুনেছে।

দুরন্ত অসুস্থতার জন্যে আমি ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। উইলি পিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে কবি আমেরিকা যাত্রা করলেন। একটি জাপানী জাহাজে আমি স্থান পেলাম।

প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কোনো সঙ্গী নেই,—শুধু নিজের মন নিয়েই আমার কাটল। মানব-সভ্যতার যুগ-যুগান্তের ইতিহাসে ধর্মের কী স্থান, এই একটি বিষয় নিয়েই আমি অহরহ চিন্তা করতে লাগলাম। অনন্ত অতীত থেকে বর্তমান মানব-সভ্যতার বিবর্তনে ধর্মের অবদান কী? ভবিষ্যৎ মানব-সমাজকে কী অনুপ্রেরণাই বা ধর্ম দেবে? বিভিন্ন ধর্মমতের নানা কোলাহলের মাঝখানে সত্যের পরম ধ্বনিটি মানবাত্মার কানে কবে বাজবে?

এই সমুদ্রযাত্রার পথে এবং পরে আরো একবার আমি যবদ্বীপে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলাম। সেখানকার বিখ্যাত মহাবুদ্ধশিলা বোরোবুদুর আমি দেখতে যাই এবং এই মন্দিরছায়াতলে কয়েকটি আবেগস্তব্ধ নিঃসঙ্গ দিন যাপন করি। এখানকার ভাস্কর্য আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এক আশ্চর্য সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। বিশ্বমানবের ধর্ম-ইতিহাসের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান ছিল আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মানুষ এক, মনুষ্যত্ব এক,—মানবতার মূল্যায়ন এক,—এই ছিল আমার বিশ্বাস। এই মন্দিরের

অলিন্দেব পর অলিন্দ পরিভ্রমণ করতে করতে ও ভাস্কর্যের অগণিত নিদর্শন দেখতে দেখতে আমি সেই সুপ্রাচীন অতীতের ধর্মকাহিনীকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে অবলোকন কবলাম।

ভাস্কর্যেব এক সুবিশাল সংগ্রহশীলা এই বোবোবুদুব। মন্দিব-প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণায় কোণায় শান্ত সৌম্য বুদ্ধেব মূর্তিব পর মূর্তি। শিলাময় ভাস্কর্যেব বেখায় বেখায় বুদ্ধ-জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি প্রস্তবচিত্রে বুদ্ধেব করুণাঘন মহত্ত্বেব প্রকাশ। কোথাও প্রেমময় প্রশান্ত বুদ্ধকে ঘিবে বযেছে মূক পশুপক্ষীব দল,—তাবাও শুনছে তাঁব করুণাব বাণী। কোথাও তাঁব শিষ্যবা আবণ্যক আদিবাসীদেব মধ্যে তাঁব করুণাব বাণী প্রচাব কবছেন। অসংখ্য শিলাচিত্রে মূর্তিমতী করুণা। আমি বুঝলাম,—প্রতীচ্য জগতেব কৃষ্ণযুগে যীশুখৃষ্টেব শুভ প্রভাব যে ভাবে ইউবোপকে বর্ববতা থেকে মানবতাব পথে পবিচালিত কবেছিল তেমনি যুগযুগান্ত পূর্বে বুদ্ধেব করুণাও প্রাচ্য জগতেব মানবতাকে বিকশিত কবেছিল।

মানবতাব পবম বাণী এই ভাবেই যুগে যুগে উদঘোষিত হযেছে। এই বাণীব অমৃত মানব-হৃদযেব গভীবতম কন্দবকে নিষিক্ত কবে মানব-জীবনকে চিবমধুময কবেছে,—অতীন্দ্রিয প্রেবণায মানব ভাগ্যকে আশ্চর্য বিবর্তনেব পথে অগ্রসব কবে নিযে গেছে। এই বাণীব প্রেবণা সমাজেব নৈতিক উজ্জীবনেব প্রাণবন্যা। প্রেমই কল্যাণ, প্রেমেব শক্তিব কাছে পাশব শক্তিব পবাজয সুনিশ্চিত—এই অমোঘ অঙ্গীকাব এই বাণী। কখনো প্রাচ্যে কখনো প্রতীচ্যে যুগে যুগে এই বাণী ঘোষণা কবেছে যে বিশ্বমানবেব কল্যাণে অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জন মানবচবিত্রেব শ্রেষ্ঠ অবদান।

সাধু জন তাঁব পত্রাবলীতে এক প্রাচীন নির্দেশ ঘোষণা কবে বলেছেন—'যে নির্দেশ পুবাতনতম আবাব সেই নির্দেশই চিরন্তন।'

কর্মের মধ্যে করুণার প্রকাশ—এই হোলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালের। ক্ষণিক অসূয়া,—প্রেম চিরন্তন। তাই বৃদ্ধ জন বলছেন,—'হে প্রিয়তমগণ, এস আমরা পরস্পরকে প্রেম করি। কারণ, প্রেম ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যেই প্রেম করে, সেই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। যে প্রেম জানে না, সে ঈশ্বরকেও জানে না, কারণ ঈশ্বরই প্রেম।'

এর পর আমাকে আবো বহুবাব দেশান্তব যাত্রা করতে হয়েছে। সমুদ্রপথে বা স্থলপথে পৃথিবীব দূব দূব দেশে আমি ভ্রমণ ববেছি। কখনো আমি গিয়েছি কবিব সঙ্গে কখনো বা প্রবাসী ভাবতীয়দেব প্রয়োজনে আমি গিয়েছি।

বর্তমানে কেনিলওয়ার্থ কাস্‌ল জাহাজে চড়ে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায চলেছি। এই নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাব সপ্তমবাব যাওয়া হোলো। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যতোটা চিনেছি পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকাও আমাব প্রায ততোটাই পরিচিত। এই সমস্ত দেশান্তব ভ্রমণের মাঝে মাঝে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস কবেছি। দিনে দিনে তাঁর প্রতি আমাব শ্রদ্ধা ও প্রেম গভীর থেকে গভীবতর হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে ভাবতবাসী নানা অন্যায় ও নানা অত্যাচাবে নিষ্পিষ্ট হয়েছে,—প্রতিকাবহীন নিত্য নিষ্পেষণেব কলংক তাব মুখেব জীর্ণ বলিরেখায়। কিন্তু তার অন্তবের নিভৃত মণিকোঠায় নিত্য অনির্বাণ সৌন্দর্য-প্রদীপ জ্বলছে,—অম্লান তার অতীন্দ্রিয় মাধুবী। ভারতবর্ষেব অন্তরদেবতার সেই চিবন্তন সৌন্দর্য-স্বরূপকে আমি শান্তিনিকেতনেব শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেবেছি।

আমার সমগ্র জীবন ভরে খৃষ্ট আমাকে কী দিয়েছেন,—কী অপরিশোধ্য অকল্পনীয় ঋণে খৃষ্টের প্রতি আমার জীবন সমর্পিত,—সেই কথাটিই নানা ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। আমার কর্মব্যস্ত জীবনে

খৃষ্টের করুণাধারার বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে আরো অনেক পরিচ্ছেদের প্রয়োজন। জীবনে যদি সুযোগ পাই তাহলে পরবর্তী কোনো সময়ে সে সব কাহিনী লিখব। আমার এই সামান্য জীবনকে আমার প্রভু তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে অভিজ্ঞতার নব নব পথে আহ্বান করে নিয়ে গেছেন, এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাব মধ্য দিয়ে তাঁব প্রেমের গভীরতাকেই দিনে দিনে অন্তবেব মধ্যে উপলব্ধি কবেছি। এই পবম উপলব্ধিব কথাই আবাব নূতন কবে আমি লিখব।

আফ্রিকাব একটি ঘটনাব কথা এখন আমি বলি। এই কাহিনীটি আমি এই গ্রন্থেব শেষ অধ্যায়েব জন্যে সঞ্চয় কবে বেখেছিলাম,—কেন না এই কাহিনী সবচেযে সুন্দব, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

পূর্ব আফ্রিকাব উগাণ্ডা বাজ্যেব বাজধানী কাম্পালাব ঠিক উপবে নামিবেমিব হাসপাতালে তখন আমি আছি। দৃষ্টিব সামনে ভিক্টোবিয়া নাযাঞ্জা হ্রদ। জীর্ণ দেহ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হচ্ছে। এখানকাব খৃষ্টান মিশনাবীদেব স্নেহমমতা আমাকে গভীব শান্তি ও আনন্দ দিযেছে। তরুণ বাগাণ্ডা খৃষ্টানদেব সংস্পর্শে আমি এসেছি,—তাবা বন্ধু বলে আমাকে তাদেব মধ্যে গ্রহণ কবেছে।

কাম্পালা থেকে আমি ঠিক হ্রদেব ধাবে জিঞ্জা নামক একটি স্থানে গেলাম। অনতিদূবে বিপন জলপ্রপাত। সেখানকাব ভাবতীয সম্প্রদায়েব অনুবোধে ইগাংগা নামক এক ক্ষুদ্র শহবে যেতে হোলো। সে শহবেব মুষ্টিমেয় ভাবতীয ব্যবসাযীবা তাদেব দোকানেব স্থান নিয়ে অসুবিধায় পডেছে। তাদেব যদি কিছুটা সাহায্য কবতে পাবি সেই জন্যে এই যাত্রা।

মোটবে আমবা ইগাংগা যাত্রা কবলাম। আমাব সঙ্গে দু-জন হিন্দু ও একজন পার্শী বন্ধু। অনেক দূব পথ অতিক্রম কবাব পব বন্ধুবা আমাকে পথ ছেডে অবণ্যে প্রবেশ কবতে অনুবোধ

করলেন। সেখানে নাকি শ্বেতকায় মিশনারীদের একটি আশ্রম আছে

গভীর অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আশ্রম। সেখানে রয়েছেন এক বৃদ্ধ রোম্যান ক্যাথলিক সাধু। আর রয়েছে দু-জন বৃদ্ধা দরিদ্র-সাধিকা। তাঁদেব ঘিরে রয়েছে স্থানীয় শিশুর দল। সভ্যতার সামান্যতম আলোকও সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেনি। শুধু প্রাগৈতিহাসিক দুবন্ত বর্বরতা,—উদ্দাম নির্লজ্জ নগ্নতা। সেই কঠোব বন্যতাব মধ্যে সভ্য জীবনযাত্রার সামান্যতম উপচারও নেই। সেই আদিম আরণ্য পবিবেশেব মধ্যে এই সাধুগোষ্ঠী তাঁদেব সমগ্র জীবন অতিবাহিত কবছেন। এখান থেকে ফিবে যাবার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁদের মনে নেই। সভ্য জগত তাঁদের ভুলে গেছে। জীবনেব সায়াহ্ন উপস্থিত। এখানেই তাঁবা দেহরক্ষা করবেন,--অবজ্ঞাত সমাধিব উপব হয়তো বা কিছুদিন জেগে থাকবে এক একটি সামান্য ক্রুস-চিহ্ন।

সভ্যতার সীমানা থেকে বহু দূরে অসভ্য মানব-সমাজেব মাঝে মাঝে এমনি অখ্যাত খৃষ্টান সেবামন্দিব আবো নানা স্থানে আমি দেখেছি। আমি দেখেছি খৃষ্টান সেবাধর্মেব অনুপ্রেবণা দুর্বল মরণশীল মানবচিত্তকে কী বিপুল আত্মদানে উদ্বোধিত কবে, সমস্ত সুখলোভ সমস্ত বাসনা-কামনাকে অবহেলা কবে আনন্দেব কী অনির্বচনীয় আবেগে খৃষ্টভক্ত মানুষ প্রেমেব আহ্বানে কল্যাণেব আদর্শে উৎসর্গ করে নশ্বর জীবন।

আমার হিন্দু ও পার্শী সঙ্গীরা আমাকে জানালেন যে ব্যবসা উপলক্ষে তাঁদের নিত্য নিয়মিত ইগাংগাতে যেতে হয়। প্রতিবারই তাঁবা বড় রাস্তা থেকে নেমে এই আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখা কবে যান। এঁদের আকর্ষণ এড়িয়ে সোজা শহরে চলে গেছেন এমন ঘটনা একটিবারও ঘটেনি।

বৃদ্ধ ক্যাথলিক ফাদার আমাকে বললেন,—এই হিন্দু ও পার্শী বণিকবা তাঁদেব কতো বড়ো বন্ধু! কতো সাহায্য তাঁবা করছেন,—আশ্রমবাসীদেব ও আশ্রিত অসভ্যদেব বোগ ও দুর্ভিক্ষেব হাত থেকে কতোবাব তাঁবা বক্ষা কবেছেন। এই প্রবাসী ভাবতীয়দেব বন্ধুত্বের কথা বলতে বলতে চিবপ্রবাসী বৃদ্ধ সাধুব চোখ অশ্রুভাবাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সাধুব কথাব উচ্চাবণ শুনে বুঝলাম আয়র্ল্যাণ্ড তাঁব মাতৃভূমি। বাল্যকাল তাঁব অতিবাহিত হয়েছিল আইবিশ ভূমি-ক্রোড়ে। সেই প্রেমমধুব মাতৃক্রোড়ে তাঁব বাল্যহৃদয যে অমৃতময়ী করুণায় অভিষিক্ত হযেছিল,—আজও এই সুদূব প্রবাসেও তাঁব পবিণত চিত্তে সেই করুণাধাবা নিত্য প্রবাহিত।

আমাদেব সঙ্গ পেযে বর্ষীযসী দবিদ্র-সাধিকাদেব আনন্দেব যেন শেষ নেই! সামান্য তাঁদেব সঞ্চয, তবু তাঁদেব কাছ থেকে কিছু আমাদেব খেযে যেতেই হবে। বিত্তহীন সেই আতিথেয়তাব অমূল্য ঐশ্বর্য। আমাদেব কুণ্ঠা হোলো পাছে আমাদেব খাওযাতে গিযে তাঁদেব সামান্য খাদ্যটুকুও ফুবিযে যায। কিন্তু তাঁদেব সেই অকুণ্ঠ আনন্দ থেকে বঞ্চিত কবি কী কবে? কৃষ্ণকায শিশুব দল নিঃশঙ্ক নিভযে আমাদেব ঘিবে ধবল। সাধু ও সাধিকাদেব তাবা একান্ত আপনাব জন বলে মনে কবে। আমাদেবও আপন কবে নিতে তাদেব দেবি লো না।

পূর্বআফ্রিকাব অসভ্য অবণ্যবাজ্যে এই খৃষ্টান আশ্রম ও এই সাধুদেব দেখে আমাব মনে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগবেব মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠবোগীদেব নিত্যসেবক ফাদাব ডামিযেনেব কথা। মনে হোলো এমনি কতো মহাপ্রাণ মানবব্রতী সমস্ত পৃথিবীব দুর্গম গহন-প্রান্তে জীবনকে তিলে তিলে দান কবছেন। খৃষ্টেব নামে খৃষ্টেব প্রেবণায় তাঁবা উদ্বোধিত,—মানবপুত্রেব নামে বিশ্বমানবেব সেবায় তাঁদেব জীবন উৎসর্গিত।

একবার আমি তখন অক্সফোর্ডে। এক ভারতীয় ছাত্র অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিল। সে বলেছিল—দেখুন, স্বদেশপ্রেমের প্রেরণাকে আমি বুঝতে পারি, যে প্রেরণায় নরনারী স্বদেশের জন্য মহা বীরত্বব্যঞ্জক কাজ করতে পারে। কিন্তু একটি জিনিষ আমি বুঝতে পারি না, আপমি বুঝিয়ে দেবেন?

আমি বলেছিলাম,—কী তুমি বুঝতে চাও?

ছাত্রটি বললে,—কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফাদাব ডামিয়েনের জীবন-যাত্রার কাহিনী আমি পড়েছি। এখানে অক্সফোর্ডে এসে আমি অনেক জ্ঞানী গুণী নরনারীর কথা শুনেছি যাঁরা নিতান্ত অখ্যাতভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিবেশে জীবন দান করেছেন আদিম অসভ্য অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যে। কীসের আকর্ষণে এমন কাজ তাঁরা করতে পেরেছেন? যীশুর নামে তাঁরা এমনি ভাবে নিঃসংশয়ে আত্মবিসর্জন করেছেন,—কোন্ মন্ত্রবলে যীশু তাঁদের এমনি পবম আত্মবিলুপ্তির পথে টেনেছেন?

এই ছাত্রটিকে আমি কেবল আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম—খৃষ্ট প্রাচীন নন, খৃষ্ট মৃত নন। চিরজীবী খৃষ্টকে যে ভক্ত প্রতিদিন অন্তরে অনুভব করে, প্রত্যক্ষরূপে প্রতিদিন সে তার হৃদয়ে তাঁব প্রেমস্পর্শ লাভ কবে, -সে-ই কেবল প্রভুর নিত্যপ্রেমের বিনিময়ে আপন প্রেমকে মানবসন্তানেব মধ্যে বিসর্পিত করে দিতে পারে। কেননা খৃষ্ট বলেছেন, -'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমি তৃষার্ত ছিলাম, রুগ্ন নগ্ন আবদ্ধ শৃংখলিত ছিলাম আমি বন্দীশালায়। আমার যারা ভ্রাতা তাদের যাকেই তুমি সামান্যতম সাহায্য করেছ, সেই সাহায্য করেছ আমাকে।'

ইগাংগার ক্যাথলিক ফাদার ও ঐ সেবিকা দুইজন তাঁদেব প্রতিদিনের প্রেমসাধনার মধ্যে নিবিড়তম বাস্তবরূপে খৃষ্টেব জীবন্ত সান্নিধ্যকে অনুভব করতেন,—তাই পৃথিবীর অবজ্ঞাত অন্ধ সীমান্তে বাস করেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আনন্দের উদ্ভাসিত আলোকে তাঁদের

অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। দিন শেষ হয়ে আসছিল,—মেতুর জীবন-সায়াহ্নছাযায় তাঁদেব মুখে ফুটে উঠছিল অন্য রাজ্যেব স্বর্গীয বিভা।

টেনিসন তাঁর এক কবিতায় প্রভুব এই নিত্য-উপস্থিতিব কথা বড়ো সুন্দব ভাবে অংকিত কবেছেন। শিশু-হাসপাতালেব একজন নার্স,—তাকে রূঢ ভাষায এক ডাক্তাব বিদ্রূপ কবে বলছে যে যীশু তো শত শত বৎসব পূর্বেকাব একজন ক্রুসবিদ্ধ মৃত মানুষ। কোথায আবাব যীশু? কোথায পুনবাবির্ভাব?

পবিত্রাতা খৃষ্টেব প্রতি অন্তবেব একনিষ্ঠ প্রেম নিযে সেবিকাটি উত্তব দিচ্ছে

কে বলে প্রাচীন? কে বলে মৃত?
এই তো সবে নব প্রভাত। এই তো আগমনী।
যদি মিথ্যা হোতো নবজীবনেব স্বপ্ন,
নবীন জগতেব আদর্শ যদি হোতো দুবাশা,
তাহলে কেমন কবে আমি হাসপাতালে কাজ কবতে পাবতাম?
কেমন কবে সহ্য কবতে পাবতাম
বোগেব বীভৎস দৃশ্য আব পুতিগন্ধ,
যদি না প্রভুব বাণী আমাব কানে বাজত,
'যে সেবা তুমি এদেব কবো সেই সেবা তুমি কবো আমাকে।'

পরম-প্রভু যীশুখৃষ্টেব নিত্যস্পর্শ মনুষ্যজাতিব প্রাণে যুগ যুগ ধবে এক অপূব প্রেবণা সঞ্চাবিত কবে এসেছে,—এই প্রেবণা সেবাব, এই প্রেরণা কল্যাণধর্মে অকুণ্ঠ আত্মবিসজনেব। খৃষ্টেব অমৃত-মন্ত্রেব এই প্রেবণা থেকে যদি আমবা বঞ্চিত হতাম, তাহলে মানব-ভবিষ্যৎ অন্ধকাবেব গভীব অতলে তলিযে যেত। যে অতল থেকে উদ্ধাবেব আশা নেই।

খৃষ্ট আমার সর্বস্ব

আমবা যারা খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসেব ক্রোড়ে জন্মলাভ কবেছি এবং বহু শতাব্দীব্যাপী খৃষ্টীয় ঐতিহ্যেব অধিকাবী হযেছি,—খৃষ্টের মহিমা প্রতি যুগে মানবজাতিব মধ্যে কী অলৌকিক প্রভাব বিস্তাব কবে, তা আমবা নিবিষ্ট মনে উপলব্ধি কবতে পাবি। খৃষ্ট-করুণাব অলৌকিক উজ্জীবনী মন্ত্র পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে পৌত্রেব মধ্যে সঞ্চাবিত হয। মৃত্যুহীন সেই মন্ত্র প্রতি যুগে নবীন আশাব ঔৎসুক্যে নবনাবীকে অনুপ্রাণিত কবে। এই অমৃতমন্ত্রেব জযযাত্রা যুগ থেকে যুগান্তবে।

এই মন্ত্রেব প্রত্যক্ষ পবীক্ষাও প্রতি যুগে। খৃষ্টানভক্ত প্রতি যুগে অকুতোভয আত্মদানেব পবীক্ষায উত্তীর্ণ হয়েছে, সপ্ত অগ্নি-পবীক্ষাব দাহনে খৃষ্টীয আদর্শ যুগে যুগে নিষ্কলুষ স্বুবর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

খৃষ্টেব সমসাময়িক শিষ্য পল বলেছিলেন,—'মহান যুদ্ধে আমি নিজেকে ব্রতী কবেছি, সম্পূর্ণ কবেছি আমাব ব্রত। বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হইনি মুহূর্তেব জন্যেও।'

অ্যাপোক্যালিপ্সিতে উল্লিখিত আছে তাঁদেব কথা,—যাবা নৃশংসতম ক্লেশেব যন্ত্রণা অতিক্রম কবেছেন, যাঁবা মেষ-বক্তে তাঁদেব পোষাক ধৌত-শুভ্র কবেছেন। সেই সব শ্বেতাম্ববধাবী শহীদদেব কথা অবিস্মবণীয যাঁবা নীবো ও ডমিনিটানেব অবর্ণনীয অত্যাচাবকে সহ্য কবেছিলেন। মানুষেব সহনশীলতাব শেষ সীমায দাঁড়িযে তাঁবা মানুষেব অশেষ মহত্ত্বেব প্রমাণ দিয়েছিলেন।

পবম আনন্দে ইগনেশিয়াস বোম মহানগবীতে যাত্রা কবলেন। সেখানে সম্রাটের নির্দেশে হিংস্র বন্য পশুব দল তাঁব দেহ ছিঁডে ছিঁডে খাবে। বিন্দুমাত্র ভয় নেই তাঁব প্রাণে, উল্লসিত আবেগভবে তাঁব

অন্তর গান করে উঠল,—এতো দিনে আমি প্রভুর প্রকৃত শিষ্যত্বের পথে পা বাড়ালাম।

আর একজন অখ্যাত খৃষ্টান নারী পার্পিতুয়া। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিন্নভিন্ন করেছিল সম্রাটপালিত নরখাদক সিংহকুল। তিনিও ভয় পাননি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জপ করেছিলেন সর্বভয়হারী খৃষ্টনাম।

এঁরা ছিলেন খৃষ্টবিশ্বাসের প্রথম সন্তান। এঁদের আবির্ভাবের জন্য পৃথিবী তখনো প্রস্তুত ছিল না। সমসাময়িক সমাজ এঁদের আসন দেয়নি, রাজশক্তি এঁদের ধ্বংস করতে চেয়েছে। এঁরা ছিলেন পরিচয়হারা স্বস্তিহারা অপাংক্তেয়, -নিপীড়িত নির্যাতিত,—প্রভুর নামে উন্মুখ হৃদয়ে শত নির্যাতন সহস্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

এমনি কতো কাহিনী আমরা জানি,—কতো কাহিনী আবার বিলুপ্ত হয়েছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কিন্তু যুগে যুগে সব কাহিনীর পিছনেই একই সংবেদন,– একই প্রেমের সেই অলৌকিক রোমাঞ্চ। যা ছিল দুঃখের কালো তা হয়ে উঠেছে আনন্দের আলো। যা ছিল মৃত্যুর হতাশ অন্ধকার,—তা রূপান্তরিত হয়েছে উদ্ভাসিত আশার পুনরুজ্জীবনে।

অকুতোভয় আত্মবিসর্জনের কতো উজ্জ্বল কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। আরো আছেন কতো শত সংখ্যাতীত নরনারী, -কোনো ইতিবৃত্তকার যাঁদের স্মরণ করেনি, কাল যাদের ভুলে গেছে,--যারা শুধু প্রভু খৃষ্টের নামে খৃষ্টের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপ্রেমের আবেগে নীরবে সবস্ববিহীনতাকে বরণ করেছেন,—নিঃশব্দ আত্মনিবেদনে খৃষ্টনির্দিষ্ট সেবাধর্মে অঞ্জলি দিয়েছেন জীবন।

প্রতি শতাব্দীতে প্রতি যুগে এই সমস্ত আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানবভাগ্যকে পবিত্র করেছেন। তাঁরা গোত্রহারা,—পরিচয়হারা দীন তাঁদের জীবনযাত্রা,—মূক তাঁদের প্রার্থনা।

তাঁরা বিশ্বের বেদনাকে অনুচ্চারিত তপস্যায় আপন বক্ষে বহন করেছেন। তাঁদের ধর্মে ও কর্মে ধ্যানে ও উদাহরণে মানব-সমাজের পুঞ্জীভূত অসুন্দরকে খৃষ্টের ক্ষমাসুন্দর চরণছায়ায় উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছে।

কোথা থেকে এতো শক্তি তাঁরা পেয়েছেন? এই শক্তির উৎস আনন্দ,—সর্বদুঃখজয়ের আনন্দ। প্রাচীন সাধুরা নিষ্ঠুরতম উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে খৃষ্টপ্রেমের গভীরতম আনন্দকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই শক্তির রহস্য তারা তাঁদের অমর প্রেমগাথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা যে গান গেয়েছেন সে গানেব সমাপ্তি নেই,—যে মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন সেই মন্ত্র অবিনশ্বর। একমাত্র প্রভু খৃষ্টের বাণীব পরেই সাধুগণের এই সব গাথার স্থান। পৃথিবীব বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে এই সব গাথা পৃথিবীব বিভিন্ন জাতিব অসংখ্য নবনারীব প্রাণে অমিত আনন্দের সঞ্চাব করেছে।

সাধু বার্ণার্ডের গীতিগুচ্ছ, ফ্রান্সিসেব পুষ্পস্তবকাবলী, সাধু টমাস কেম্পিসের খৃষ্টানুসরণ,—এগুলি অমব সৃষ্টি। এরা বারে বাবে ঘোষণা করে যে ক্রুসের অত্যাচাবেব পিছনে আনন্দ ও শান্তির নূতন বাজ্য সমাসীন। এই বাজ্য কোনো অবাস্তব স্বর্গরাজ্য নয়। এরা বলে যে পরমানন্দের অক্ষয় বাজ্যলাভ এই মবজগতেই সম্ভব। খৃষ্ট যুগে যুগে আহ্বান করেছেন,—'আমাকে অনুসবণ কবো।' যাবা প্রেমিক যাবা সর্ববন্ধনহারা নির্ভীক খৃষ্ট-পথযাত্রী,—তাবাই এই রাজ্যেব স্বর্ণসিংহদ্বাবে উত্তীর্ণ হয়।

আমাদের এই বর্তমান যুগেও খৃষ্ট-পথানুসরণের অতৃপ্ত পিয়াসাব পরিচয় আমরা দিকে দিকে লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছি। প্রভু যীশুব জন্য আত্মোৎসর্গকারীর অভাব এ যুগেও নেই। প্রবল জ্ববাক্রান্ত দেহে নতজানু হয়ে সম্মুখে নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রন্থ স্থাপন করে মধ্য আফ্রিকার নিঃসঙ্গ অন্ধকারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন লিভিংষ্টোন। যাদের সমস্ত

অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন মিলানেসিয়ার সেই অজ্ঞ আদিবাসীদের হাতে নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করেছেন কোল্‌রিজ প্যাটারসন। উগাণ্ডাতে হ্যানিংটনের ভাগ্যেও জুটেছে একই প্রকার আত্মবলিদান। সাধু সুন্দর সিং জীবনপণ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন তিব্বতে। জাপানের কাগাওয়া দীনতম দীনজনের দুর্গতির অন্ধকারকে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আপন জীবনকে জ্বলন্ত শিখার মতো দাহন করেছেন। বর্ণবৈরিতার আঘাত-জর্জর আফ্রিকান জাতির দুঃসহ ক্ষতযন্ত্রণা খৃষ্টপ্রেমের প্রলেপে বিদূরিত করার জন্য অনির্বাণ অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন আগ্রে। আর ফিজির ঐ সব খৃষ্টবিশ্বাসী তরুণদল, –ওরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিত্রাতার জয়গান গেয়ে খৃষ্টের নামে জীবনাহুতির সংকল্প নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে।

আরো আছে কতো অসংখ্য অপরিচিত নরনারী,—বৃদ্ধ তরুণ ও শিশু,—তারা নিতান্ত সম্প্রতি কালেও খৃষ্ট-বিশ্বাসের পরম দাবীকে পালন করছে প্রতিদিনের কল্যাণব্রতে। তারা রয়েছে আমাদের আশেপাশে,—হাত বাড়ালেই তাদের প্রিয়করস্পর্শ আমরা লাভ করি। তাদের মুখ থেকেই আমরা শুনতে পাই কী তাদের মন্ত্র, কী তাদের জীবনীশক্তির রহস্য-উৎস। এ রহস্য কোনো গোপন রহস্য নয়, এ শুধু ভক্ত-হৃদয়ের একটি মাত্র চিরন্তন পরম অঙ্গীকার,—যে প্রভু আমার জন্য জীবনদান করেছেন, এ জীবনকে নিবেদন করেছি শুধু তাঁরই জন্যে, তাঁরই পথে তাঁরই ব্রতে এ জীবনের সারাৎসার।

এই গ্রন্থের শেষে এই যে সব মহান সর্বরিক্ত সাধকদের নাম করলাম,—এই সঙ্গে আরো দু-জনকে আমি স্মরণ করি। আত্মোৎসর্গ ও প্রেমব্রতের জীবন্ত উদাহরণে সর্বপ্রথম তাঁরাই খৃষ্টপ্রেমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের প্রতি আমার দৃষ্টি উন্মোচন করেছিলেন। যীশুখৃষ্টের প্রতি আমার যা ঋণ, সেই ঋণ আমার তাঁদের প্রতিও। তাঁরাই আমার খৃষ্ট-নিবেদিত জীবনের জনক-জননী,—আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী।

সমাপ্ত

চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ

জন্ম	মৃত্যু
নিউক্যাসেল অন্-টাইন	কলিকাতা
১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭১	৫ই এপ্রিল ১৯৪০

প্রধান রচনাবলী

১৯১২—The Renaissance in India
১৯২৩—Christ and Labour
১৯৩০—India and the Simon Report
১৯৩২—What I Owe to Christ
১৯৩৩—Christ in the Silence
১৯৩৪—Sadhu Sundar Singh
১৯৩৭—India and the Pacific
১৯৩৭—Christ and Human Need
১৯৩৯—The True India
১৯৩৯—The Inner Life
১৯৪০—Sandhya Meditations
১৯৪০—The Good Shepherd
১৯৪১—The Sermon on the Mount

প্রধান সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১৯২৮—Thoughts from Tagore
১৯২৯—Mahatma Gandhi's Ideas
১৯৩০—Mahatma Gandhi --His Own Story
১৯৩১—Mahatma Gandhi at Work